ভাই বোন

রবিদাস সাহা রায়

গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে হুস-হুস-হুস।

ভোর তখনো হয়নি। শুকতারা আকাশে জ্বলছে।

রেলগাড়িটা এগিয়ে আসছে হয়তো গাঁয়ের স্টেশনের দিকে। শব্দটা ধীরে ধীরে বেড়েই যাচ্ছে।

মণি উঠে বসল বিছানার উপর। দেখল, মা আর ছোট বোন মুক্তা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

গায়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ডাকল বোনকে—এই মুক্তা, ওঠ। ঐ গাড়ি এসে পড়ল, চল।

কিন্তু মুক্তার ঘুম ভাঙল না।

বেশী জোরে ডাকতে সাহস হল না মণির, পাছে মায়ের ঘুম ভেঙে যায়।

আস্তে আস্তে ডাকল—মুক্তা, এই মুক্তা, ওঠ।

মুক্তা উঠল না। একাই মণি উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। ঘরের দোরটা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আকাশ তখনো ফরসা হয়নি। আবছা অন্ধকার ঘিরে রয়েছে দূরের বাঁশ বন, তাল, শিমুল, আম আর কাঁঠাল গাছের মাথায়।

একটু ভয় ভয় করছে। তবু এগিয়ে চলল মণি। দেরি করলে গাড়িটা হয়তো চলে যাবে; তার বাবাও হয়তো রাগ করে চলে যাবে কাউকে দেখতে না পেয়ে।

বাড়ির সীমানা পেরিয়ে জাম গাছটার তলায় আসতেই ফিরে দাঁড়াল মণি। পেছন থেকে মুক্তা ডাকছে—দাদা! দাদা!

মুক্তাও উঠে এসেছে চুপি চুপি।

কাছে আসতেই মণি জিজ্ঞেস করল—মা টের পায়নি তো?

মুক্তা বলল—কি করে টের পাবে? মার যে জ্বর হয়েছে; খালি ঘুমুচ্ছে।

—চল, ছুটে চল, গাড়ি এসে পড়ল বুঝি।

গাঁয়ের পথ দিয়ে দুজনেই ছুটে চলল। ঝোপ-ঝাড় ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় আসতেই, মনে হল যেন আকাশটা অনেক ফরসা হয়ে গেছে।

মনের ভয়ও তাদের কমে গেল।

দূর থেকে গাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। পথের এক জায়গায় এসে তারা দাঁড়াল। সেখান থেকে রেল লাইনটা অনেক কাছে। পথ সেখান থেকে বাঁক ঘুরে চলে গেছে স্টেশনের দিকে।

স্টেশন এখান থেকে অনেকটা দূরে। বাজারের গা ঘেষে পথটা চলে গেছে আঁকা বাঁকা হয়ে। স্টেশনের গায়ে গিয়ে সেটা মিশেছে।

মণি ও মুক্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে। গাড়ির ছোট ছোট খোপে বসে আছে কত লোক। তার মধ্যে হয়তো তাদের বাবাও আছে।

গাড়ি চলে গেল। কেউ হাত বাড়াল না, কেউ কোন ইশারা করল না গাড়ি থেকে। তবে কি তাদের বাবা আজও আসেনি?

তবু তারা দাঁড়িয়ে রইল। যদি বাবা তাদের না দেখে থাকে? স্টেশনে নেমে যদি চলে আসে তাদের বাবা? এই পথ দিয়েই তো আসবে? তাই দাঁড়িয়েই রইল।

গাড়ি স্টেশন ছাড়িয়েও চলে গেল। আকাশ তখন ফরসা হয়ে গেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পথ ঘাট।

কয়েকজন যাত্রী নামল স্টেশনে। কিন্তু এ পথ দিয়ে এল না কোন লোক।

মণি ও মুক্তার বুক থেকে গভীর নিশ্বাস নেমে এল।

মুক্তা বলল—চল দাদা, বাড়ি ফিরে যাই। মা হয়তো ঘুম থেকে উঠে গেছে।

মণি বলল—বাবা আজও এল না রে। মিছিমিছি মা আমাদের ভোলাচ্ছে। কবে আসবে কে জানে?

দু'জনেই ফিরল। যাবার সময় তাদের মনে ছিল উৎসাহ, পায়ে ছিল চলার ছন্দ। এখন ফিরবার পথে মন চলছে না, পা এগোচ্ছে না।

মুক্তা বলল—দুপুরবেলা আবার যে একটা গাড়ি আসবে, সেটাতে বাবা যদি আসে?

মণি বলল—ক'দিনই তো এলাম। বাবা তো এল না।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা দাদা, ঝুনু, বাদল, হারু ওদের বাবা তো গাড়ি চড়ে আসে না। আমাদের বাবা গাড়ি চড়ে আসে কেন?

মণি জবাব দিল—ওদের বাবা তো আর বিদেশে চাকরি করে না। দুপুরে আবার আসব গাড়ি দেখতে। তুই আসবি?

মুক্তা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল—হ্যাঁ। আজ যদি সত্যি বাবা আসে?

মণি বলল—কি মজাই তখন হবে!

মুক্তা বলল—তোর জন্য নতুন জামা আনবে, আমার জন্য আনবে ছোট রাঙা শাড়ি আর পুতুল।

মণি বলল—ইস, আমার জন্য বুঝি শুধু জামা আনবে? ছবির বই আনবে না বুঝি? বাবাই তো বলে গেছিল ছবির বই আনবে।

মুক্তা ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ আনবে। আর মায়ের জন্য আনবে খুব সুন্দর শাড়ি। মার যে একটাও ভাল শাড়ি নেই। তাই তো বাবাকে ভাল শাড়ি আনতে বলে দিয়েছে।

দু'জনেই কথা বলতে বলতে গাঁয়ের পথ দিয়ে চলতে লাগল। ঝিরঝির করে ভোরের হাওয়া বইছে। গাছের ডালে ডালে ডাকছে শালিক, ফিঙে ও নানারকম পাখি।

বাড়ির কাছে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। মণি হাত বাড়িয়ে দেখাল মুক্তাকে। ওদের আম গাছে মুকুল ধরেছে। বলল—ঐ ছাখ মুক্তা, কত আমের বোল।

এই নূতন আবিষ্কার করে যেন ওর মনে কত আনন্দ!

মুক্তা বলল—বাঃ, কি মজা। কত আম হবে। ইস্, বাবা যে কি! খালি আসতে দেরি করছে।

ততক্ষণে তারা বাড়ির দুয়ারে এসে গেছে। মা সারদা ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় ঝাঁট দিচ্ছে। মণি চুপি চুপি মুক্তাকে বলল—আমরা যে গাড়ি দেখতে গেছিলাম, মাকে বলিস না কিন্তু।

দু'জনে পা টিপে টিপে ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের মা দেখতে পেয়ে বলে উঠল—কি রে, কোথায় গেছিলি এই ভোরবেলায়?

মুক্তা বলল—মা, দেখ, আমাদের আমগাছে কত বোল ধরেছে।

সারদার শরীর ভাল নয়। বেশী কথা বলার মত মনের অবস্থাও তার নেই। শুধু মুখ উঁচু করে গাছের মাথার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর বলল—হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বস, মণি।

ঘরের কাছেই মাটির হাঁড়িতে জল ছিল। মণি ও মুক্তা দু'জনেই হাত মুখ ধুয়ে নিল। বারান্দায় চট

বিছিয়ে মণি বই সেট নিয়ে বসল; মুক্তা পাশেই বসল তার পুতুলের বাক্স নিয়ে।

মণি সুর করে পড়তে শুরু করল—

সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

মুক্তা তার পুতুলকে কাপড় পরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু কাপড় পরাতে গিয়ে একটা পুতুল হাত থেকে পড়ে গেল। ভেঙে গেল পুতুলটা।

বেচারীর কাঁদো কাঁদো অবস্থা। রক্ষা, তার নিজের হাত থেকে পড়েছে। অন্য কারুর হাতে ভাঙলে আর উপায় ছিল না। কেঁদেকেটে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে ফেলত।

বার বার জোড়া লাগিয়ে দেখতে লাগল পুতুলটাকে। তারপর মণিকে বলল—দাদা, পুতুলটা ঠিক করে দিবি?

মণি পড়া বন্ধ করে বলল—দেখি। ইস্, এ যে একেবারেই মাথা ভেঙে গেছে। দে এটাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে। বলে পুতুলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুয়ারে ঝোপের দিকে। দুয়ারে তুলসীতলার কাছেই কচুর ঝোপ। সেখানে পড়ে ভাঙা পুতুলটা আরো ভেঙে গেল।

মুক্তা এবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। মা ছুটে এল ঘর থেকে। মুক্তা তখন মণির বইটা ছেঁড়বার জন্য দু'হাতে টানছে। মণিও সজোরে বইটা চেপে ধরেছে।

সারদা বইটাকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। জিজ্ঞেস করল—কি রে, কি হয়েছে?

মুক্তা বলল—আমার পুতুল ফেলে দিয়েছে কেন?

মণি বলল—মাথা ভাঙা পুতুল, তার জন্য এত?

সারদা চোখ রাঙিয়ে বলল—ফেললি কেন? নিয়ে আয় পুতুলটা।

মণি বারান্দা থেকে নীচে নেমে পুতুলের টুকরাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে এল। ভাঙা পুতুলটাকে দেখে মুক্তার শোক আরো বেড়ে গেল। বলল—এত ভাঙা ছিল না তো।

সারদা প্রবোধ দিয়ে বলল—আচ্ছা, আমি গড়ে দেব তোকে একটা পুতুল। এখন যে পুতুল আছে তাই দিয়ে খেলা কর।

মুক্তা বলল—বাঃ, তুমি পুতুল গড়বে, রং পাবে কোথায়?

সারদা বলল—রং কিনে আনব হাট থেকে।

মুক্তা আশ্বস্ত হয়ে আর সব পুতুলগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল।

মণি আবার পড়া শুরু করল—

আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে,
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।
ভাই বোন সকলেরে যেন ভালবাসি,
মোর লাগি ব্যথা নাহি পায় দাসদাসী।

একটু বেলা হলে বেতের ছোট্ কাঠায় করে মা তাদের মুড়ি দিয়ে গেল। মুড়ি খেতে খেতে ঝগড়ার কথা ভুলে গেল দু'জনেই।

মুক্তা বলল—মা যদি না দেয় তবে তুই গড়ে দিবি তো পুতুল?

মণি বলল—আচ্ছা দেব।

সারদা ওদিকে রান্নাঘরে শুকনো ডালপাতা দিয়ে উনুন ধরিয়েছে। মণিকে ডেকে বলল—যা তো মণি, বড় পুকুর থেকে কলমি শাক তুলে নিয়ে আয়। বেশী আনিস নে যেন, শুধু তুই আর মুক্তা খাবি। আমি ডাল চড়িয়ে দিচ্ছি।

মণি জিজ্ঞেস করল—তুমি খাবে না মা?

সারদা জবাব দিল—আমার জ্বর হয়েছে, খাব না।

মণি বই সেট ফেলে রেখেই চলল পুকুরের দিকে। পেছনে পেছনে মুক্তাও চলল।

সারদা ডেকে বলল—বেশী জলে নামিস নি যেন। কাছ থেকেই তুলে আনবি। বুঝলি?

দূর থেকে শুধু তাদের জবাব শোনা গেল—আচ্ছা।

দু'জনেই মনের আনন্দে ছুটে চলেছে।

পুকুর পাড়ে গিয়েও তাদের আনন্দ কম নয়। মণি তুলল কলমি শাক আর মুক্তা তুলল ফুল। দু'হাতের মুঠোয় করে অনেক কলমি ফুল তুলে নিয়ে এল।

ফিরে এসে দেখল মা মাথায় হাত দিয়ে উনুনের

ধারে বসে আছে। বোধ হয় তার জ্বর বেড়ে গেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে মণি আর মুক্তা দু'জনেই শাক বাছতে লেগে গেল।

দুপুরে মা ঘুমিয়েছে। মণি আর মুক্তা মার পাশে শুয়ে ঘুমের ভান করেও কিছুতেই ঘুমাতে পারল না। ঘুম এল না। এক সময় দু'জনেই উঠে বারান্দায় চলে এল।

মুক্তা বলল—মার তে জ্বর হয়েছে, তুই গড়ে দে না পুতুল।

মণি বলল—মাটি এনে দে!

তুলসীতলার কাছেই মাটি জড়ো করা ছিল। ভাল আঁটালে মাটি। সেখান থেকে মুক্তা একতাল মাটি নিয়ে এল। ঘটি করে জল নিয়ে এল ছোট এঁদো পুকুর থেকে। মণি মাটি গুলে পুতুল গড়তে শুরু করল। একটার বদলে দু'টো পুতুলই তৈরী হল। মুক্তা দেখে খুব খুশী। পুতুল দু'টো রোদে শুকোতে দিয়ে মণি বলল—যা, ঘর থেকে একটু চুন আর হলদির গুঁড়ো নিয়ে আয়।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—হলদির গুঁড়ো দিয়ে রং করবি?

মণি বলল—হ্যাঁ। চুন আর হলদির গুঁড়ো মিশিয়ে খাসা রং তৈরী হবে। দেখবি কি সুন্দর হবে তোর পুতুল।

মুক্তা ছুটল ঘরের দিকে। মণি বলল—চুপি চুপি আনবি। দেখিস, মা যেন টের না পায়।

মুক্তা অবশ্য খুব চুপি চুপিই দাদার হুকুম পালন করল।

চুনের সাদা রং, হলুদের হলুদ রং, আর চুনে হলুদে মিশিয়ে লাল রং—এই তিন রং দিয়ে রং করা হল পুতুল। পুতুল দুটোকে আবার রোদে দিয়ে বলল—একটু শুকিয়ে নিই, আমার দোয়াতের কালি দিয়ে চোখ এঁকে দেব।

মুক্তার কিন্তু দেরি সহ্য হল না। সে দাদার দোয়াত কলম নিয়ে এল। বলল—এবার চড়ক পুজার মেলায় সময় অনেক পুতুল কিনব না রে দাদা?

মণি তুলল কলমি শাক আর মুক্তা তুলল ফুল। [পৃষ্ঠা ৫৫৪

মণি বলল—কি দিয়ে কিনবি, তোর পয়সা আছে?

মুক্তা বলল—বাবা দেবে।

মণি বলল—বাবা যদি না আসে?

এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল মুক্তা। বাবা যদি তার না আসে? পুতুল কেনা হবে না, টোপা কেনা হবে না, ফুলুরি, গজাও কেনা হবে না। মেলার আনন্দই তাহলে মাটি হয়ে যাবে।

বেলা পড়ে এল। গাছের ছায়া নামল তাদের উঠানে। মুক্তা বলল—দাদা, গাড়ি দেখতে যাবি না?

মণির এতক্ষণ খেয়াল ছিল না। মুক্তার কথায় মনে পড়ল। পুতুলের একটা চোখ মাত্র সারা হয়েছে। সেগুলি রোদের জায়গায় সরিয়ে রেখে দু'জনেই চলল স্টেশনের দিকে। যদি এই গাড়িতে এসে পড়ে তাদের বাবা? যদি তারা স্টেশনের যাবার আগেই বাবা বাড়িতে পৌঁছে যায়? তাহলে

বাবার আসার আনন্দটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারবে না তারা।

আবার সেই মেঠো পথ। ঝিরঝির হাওয়া। পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে মধুর গান। বসন্তকাল আসছে। আম কাঁঠালের মুকুলে তারই সমারোহ।

একটা কাঁঠাল গাছের দিকে চেয়ে মুক্তা বলল—ছাখ রে, কাঁঠাল গাছেও বোল ধরেছে, কি মজা!

মণি বলল—আম হবে, কাঁঠাল হবে, জাম হবে, জামরুল হবে—

মুক্তা আনন্দে নেচে উঠল—বাঃ কত কিছু হবে। ভারী মজা! বাবা এলে আরো মজা হবে।

এমন সময় দূরে গাড়ির বাঁশী বেজে উঠল—পু—পু—পু। দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে তাকাল সেদিকে। রেলগাড়ি ধোঁয়া ছেড়ে হুইসেল বাজিয়ে এগিয়ে আসছে।

গাড়িটা তাদের সমুখ দিয়ে চলে গেল, স্টেশনে গিয়ে ভিড়ল। কিন্তু কৈ, তাদের বাবা তো এল না!

মুক্তা বলল—দাদা, চল বাড়ি যাই।

মণি বলল—চল। বাবা আর আসবে না। চোখে জল এসে পড়ল মণির। দেখাদেখি মুক্তারও চোখ ছলছল করে উঠল।

তবু কিছুক্ষণ দু'জনে দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধভাবে।

শীতকালের বেলা। দেখতে দেখতে মাঠে বিকেলের ছায়া নেমে এল। তারা এবার চলল বাড়ির দিকে। দেরি করলে মা বকুনি দেবে।

মণির বয়স সাত আর মুক্তার বয়স চার। যেন অনাদরের দুটি জলে ভেসে আসা ফুল। তাদের যেন কোন প্রয়োজন নেই; অকারণে জলের উপর ভেসে বেড়ায়।

মণি শুনেছে, ওর বাবা এই বাংলা দেশ ছাড়িয়ে আসামের কোন এক শহরে চাকরি করে। মাইনে কত পায়, তা সে জানে না। তবে বাবার সাজ-পোশাক দেখে বুঝতে পারে, উঁচু দরের চাকুরে সে নয়। সংসারের অভাব অনটন বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, তবু সময় সময় যখন সে দেখে, অতি দরকারী জিনিস তার নেই, তখন তার দুঃখ হয়। বাবা বাড়ি না থাকলে মেলার জন্য পয়সা পাওয়া যায় না, ভানুমতীর খেলা দেখবার দু'টো পয়সাও মা দিতে পারে না তখন রাগ হয় তার খুব। মুক্তাও বায়না ধরে কাঁদে। আবার কাঁদতে কাঁদতে আপনি শান্ত হয়।

তবু ছ'মাস বাদে বাবা যখন একবার করে আসে, তখন কয়েকটা দিন বেশ কাটে তাদের। বাবা কিছু না কিছু নিয়ে আসে তাদের জন্য। পূজার সময় নিয়ে আসে কাপড় জামা, আর অন্য সময় যখন আসে তখন নিয়ে আসে কিছু খাবার জিনিস। বেশ লাগে খেতে। সেগুলি নাকি শহরের লোকেরাই খায়। মণি আর মুক্তা ভাবে, তারা শহরের লোক হলে কত বেশী করে সে সব মিষ্টি খাবার খেতে পারত।

বাবার চলে যাবার দিন ঘনিয়ে এলে মণি বলে—বাবা, আমি শহরে যাব।

মুক্তা বলে—আমিও যাব।

বাবা জবাব দেয়—বড় হলে যাবি বৈকি, তোরা সবাই শহরে যাবি।

মুক্তা বলে—মাকেও নিয়ে যাবে?

বাবা জবাব দেয়—হ্যাঁ, তোর মাও যাবে।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে দু'জনার মুখ।

বাবা চলে গেলে ক'দিন কি খারাপ লাগে তাদের। পড়ায় মন বসে না, খেলতে ইচ্ছা করে না, এমন কি খেতেও ভাল লাগে না কিছু। আবার বাবা কবে আসবে সেই আশায় দিন গুণতে থাকে তারা।

এবার কিন্তু পূজার আগে বাবা আসেনি। মায়ের কাছে শুনেছিল, বাবার চাকরি চলে গেছে। নূতন চাকরি যোগাড় করছে বাবা। ডাকঘরের পিয়ন এসে পুঁটলি বাঁধা কাপড়জামা দিয়ে গেছে। সে পুঁটুলি মোড়ানো ছিল পাতলা চট দিয়ে। পুঁটলির উপর কত কিছু লেখা ছিল। লাল কি একটা জিনিস লাগানো ছিল তার গায়ে। মণি ভেবে পায় না, কি করে বাবার দেওয়া কাপড় জামা ডাকঘরের পিয়নরা দিয়ে যায়! তাহলে পিয়নরা নিশ্চয়ই জানে, বাবা কোথায় থাকে। পিয়নরা চেনে তার বাবাকে।

বাবা নাকি চিঠি লিখেছিল, পূজার কিছুদিন পরেই আসবে। কিন্তু পূজার পর চারমাস চলে গেল। বাবা আসছে না তো? কেন মিছেমিছি এত দেরি করছে বাবা?

মণি ও মুক্তা দু'জনেরই ভয়ানক রাগ হল বাবার উপর। দু'বেলা গাড়ি দেখে দেখে ফিরে গিয়ে বাবার আসার আশা ছেড়েই দিল তারা।

দিন চলতে লাগল। তবু বাবার কথা ভুলতে পারল না।

মা সময় সময় বসে বসে চোখের জল ফেলে। বাবার নাকি চিঠিও আসছে না অনেকদিন ধরে।

মণি বলে—মা, পিয়নকে বললে হয় না? সে বাবার চিঠি এনে দেবে।

সারদা কোন জবাব দেয় না। চুপ করে বসে থাকে।

ডাকঘরের পিয়ন রোজ আসে না এই গাঁয়ে। দু'তিন দিন পর পর আসে। একদিন দুপুর বেলা মণি দেখল, দূরের পথ দিয়ে ডাকপিয়ন যাচ্ছে। মণি ছুটে গেল তাকে ধরতে। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে পিয়ন। মণি আরো জোরে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে উঠল। পিয়নের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—আমার বাবার চিঠি আছে।

পিয়ন দাঁড়িয়ে হাতের চিঠিগুলো দেখতে লাগল।

মণির বুকটা ধুকপুক করতে লাগল।

কয়েকটা চিঠি দেখে নিয়ে পিয়ন বলল—না, তোমাদের কোন চিঠি নেই।

বুকের ধুকপুক শব্দটা একেবারেই থেমে গেল মণির। গায়ের জোর কমে গেল। হাত পা যেন অবশ হয়ে এল। হতাশভাবে জিজ্ঞেস করল—বাবা চিঠি দেয়নি?

পিয়ন বলল—না খোকাবাবু। চিঠি দিলে ঠিক নিয়ে আসব।

মণি জিজ্ঞেস করল—কবে আনবে?

পিয়ন বলল—যেদিন তোমার বাবা দেবে, সেদিনই নিয়ে আসব।

পিয়ন চলে গেল। মণি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইল। পথের বাঁক ঘুরে গাছের আড়ালে চলে গেলে পর সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

(ক্রমশঃ)

সত্যি প্রবাদ

আফ্রিকার সারা মাজিঙ্গায়া সম্প্রদায়ের মেয়েদের কাদার উপর নাচা হল এক ধরনের সামাজিক উৎসব। এইভাবে নেচে তারা খুব আনন্দ পায়। এই আনন্দ করা নাচের ফলে ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক উপার্জন হয়। নাচের জায়গায় কাদায় ভর্তি করে যখন নাচ শুরু হয়, নর্তকীদের পায়ের দাপটে গলিত কর্দম ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠতে থাকে। তখন তা থেকে ইট তৈরি করা হয়। স্থানীয় গ্রাম্যপ্রধান গ্রামের মেয়েদের উৎসবে নিমন্ত্রণ করে কাদা দিয়ে নাচের জায়গা ভরে দেয়। নাচের শেষে সেই কাদায় ইট তৈরি করে লাভ করে। বোঝা যাচ্ছে ঢেউ গুনে অর্থোপার্জন করা প্রবাদ অন্য বিষয়েও খাটে।*

* রিপ্লে থেকে

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

২

দেখতে দেখতে ঘুরে গেল মাস। আমগাছের মুকুলে ফল ধরতে শুরু করল। গাছের ডালপালা ভরে উঠল কচি কচি আমে।

মণির চেয়েও আনন্দ মুক্তার বেশী। হাত বাড়িয়ে দেখাল—ঐ ছাখ দাদা, কত আম হয়েছে!

মণি ধমক দিয়ে বলল—আঙুল দেখাস না, আমে পোকা ধরে যাবে।

মুক্তা বলল—সব আমে পোকা ধরবে?

মণি বলল—কোন্ আঙলে দেখিয়েছিস দেখি? এক চোখ বুজে কামড় দে সেই আঙুলে।

মুক্তা ভয়ে ভয়ে চোখ বুজে আঙুলে কামড় দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল—আর পোকা ধরবে না তো?

মণি বলল—না। আর অমন করে দেখাবি না।

মুক্তা এবার হাত না বাড়িয়েই গাছের দিকে চেয়ে মুখে মুখে গুনতে শুরু করল—এক, দুই, তিন, পাঁচ, নয়, এগারো, বারো—

মণি আবার ধমক দেয় মুক্তাকে—যাঃ, গুনতে পারে না, আবার গুনতে আসে। অনেক আম হয়েছে, এত গুনতে পারবি?

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—তুই পারবি?

মণি জবাব দিল—গুনব কেন? গুনলে যদি কমে যায়?

মুক্তা বলল—আম আর একটু বড় হলেই বাবা আসবে, না রে দাদা?

মণি বলল—হ্যাঁ, তখনই তো বাবা আসে।

কিন্তু সহসা তার মনটা দমে যায়। পূজায় সময় বাবা আসেনি। এ সময়েও যদি না আসে? নিজের মনেই জ্বলতে থাকে মণি। মুক্তাকে কিছু বলে না।

কচি আমের গন্ধে মাতাল হয়ে ওঠে গ্রামের ছেলে-মেয়ে। আমে সবে মাত্র আঁটি ধরেছে। অশান্ত বাতাসে ঝরে পড়ে মাঝে মাঝে গাছের তলায়। তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যায়।

বাদল, হারু, কানু সবাই ঘুরে বেড়ায় গাছের তলায়। কারুর হাতে ছুরি, কারুর হাতে ঝিনুক আর কারুর হাতে নুন। মণি আর মুক্তা এসে যোগ দেয় তাদের দলে।

মণি এবার আগে থাকতেই একটা ঝিনুককে পাথরে ঘষে ঘষে ঠিক করে নিয়েছে। বেশ কাঁচা আম কাটা যায় তাতে।

কানু বলল—দে তো মণি, তোর আমকাটা ঝিনুকটা।

ঐ হিজল গাছের কাছে যে ভূতো আমগাছটা আছে, সেখানে যাবি? সে গাছে এতো বড় আম হয়েছে।

হাত দিয়ে কানু আমের আকারটা দেখিয়ে দেয়।

মণি বলল—আমাকে দিবি তো আম?

কানু বলল—দেব চল।

মুক্তা বলল—দাদা, আমিও যাব।

মণি বলল—তুই যাস না, ওখানে ভূত আছে!

মুক্তা বলল—যাঃ, ভূত নেই। দিনের বেলা আবার ভূত থাকে নাকি?

কানু বলল—মুক্তা, তোর যেয়ে কাজ নেই, তোর জন্য কাঁচা আম নিয়ে আসব।

মুক্তা কেঁদে ফেলল—না, আমি যাব।

মণি বলল—ভয় পাবি না তো?

মুক্তা বলল—না।

বাদল বলল—আমার দিকে তাকা তো দেখি, তোর ভয় করবে কিনা পরখ করে দেখছি।

মুক্তা কানুর দিকে তাকাল। কানু ছড়া কাটার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল—পান্তা ভাত খাবি?

মুক্তা ঘাড় নেড়ে জবাব দিল—হ্যাঁ।

বাদল আবার জিজ্ঞেস করল—বাঘ মারতে যাবি?

মুক্তা জবাব না দিয়ে চেয়ে রইল কানুর মুখের দিকে। মণি বলল—বল যাব, নইলে হবে না।

মুক্তা বলল—হ্যাঁ যাব।

বাদল জিজ্ঞেস করল—বাঘ দেখে ভয় পাবি না তো?

মুক্তা বলল—না।

এবার কানু হাতের আঙুলটাকে মুক্তার চোখের সামনে নিয়ে নাড়তে লাগল। মুক্তা ভয়ে চোখ বুজে ফেলল।

কানু চেঁচিয়ে বলে উঠল—হল না, হল না। ভয় পেয়ে গেলি।

মুক্তা বলল—আচ্ছা, আবার। এবার ভয় পাব না।

বাদল আবার শুরু করল—

পান্তা ভাত খাবি?
বাঘ মারতে যাবি?
বাঘ দেখে ভয় পাবি না তো?

বলে হাতের আঙুল নাড়তে লাগল মুক্তার চোখের সামনে। মুক্তা চোখ টান করে রইল। চোখের পলক পড়তে দিল না।

বলল—এবার হয়েছে, চল।

মুক্তা মনের আনন্দে চলল সবার সঙ্গে। বড় পুকুরের পাড় ঘেঁষে বাঁশবনের পাশ দিয়ে তারা চলল। অনেকক্ষণ পথ হেঁটে এল হিজল গাছের সামনে। পাশেই কয়েকটা বড় বড় দেবদারু গাছ। তার পাশে একটা আমগাছ। গাছটা বহুদিনের পুরনো। কালো শ্যাওলা পড়া তার গুড়ি। এই জন্যই হয়তো নাম হয়েছে ভূতো আমগাছ।

ডালপালা ছেয়ে আম হয়েছে গাছটায়। বেশী উঁচুতে নয়—ছড়ানো ডালপালায় দেখা যাচ্ছে অনেক কাঁচা আম।

কানু বলল—ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে আয় তো মুক্তা, ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়তে হবে।

মুক্তা এদিক-ওদিক ঘুরে নিয়ে এল কয়েকটি মাটির ঢেলা, ভাঙা খোলা আর মাটির হাঁড়ির টুকরা। কানু, বাদল আর মণি ঢিল ছুঁড়তে লাগল। ছোট বড় মিলিয়ে অনেকগুলো আম পড়ল মাটিতে। মুক্তা কুড়িয়ে কুড়িয়ে কোঁচড়ে ভরতে লাগল।

এবার আম খাওয়ার পালা। কানু বলল—চল জঙ্গলের ওধারে বসে খাইগে। কেউ দেখতে পাবে না।

সবাই ছুটতে লাগল। ঘুরে জঙ্গলের ওধারে চলে এল তারা। ফাঁকা জায়গা। কাশের ক্ষেত শুকিয়ে ঘন-বিরল হয়ে এসেছে। কানু এক জায়গায় বসে পড়ে বলল—দেখি ত মুক্তা, কত আম হয়েছে!

মণি চলে গেছে একটু দূরে। সে বলল—এখানে আয়, এ জায়গাটা কি ভাল।

মুক্তা দৌড়ে গেল সেখানে। কোঁচড় থেকে সবগুলো আম মাটিতে ফেলে দিল। কানু আমকাটা ঝিনুকটা মণির কাছ থেকে চেয়ে নিল। তারপর কাঁচা আমের খোসা ছাড়াতে লাগল।

কি টক্ আম! বাদল মুখে দিয়েই অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে উঠল। তবু খেতে লাগল সবাই। তাড়াতাড়ি

নুন গেল ফুরিয়ে। কানু বলল—কাল বেশী করে নুন আনতে হবে রে!

বাদল বলল—আর কিছু লঙ্কার গুঁড়ো।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—ভূতো গাছের আম এত টক হয় কেন রে?

বাদল বলল—ও গাছে ভূত আছে কিনা, তাই।

মণি বলল—পাকলে কিন্তু ভারী মিষ্টি হয়।

মুক্তা বলল—তখন বুঝি ভূত চলে যায়?

কানু বলল—এবার আম পাকলে চুপিচুপি খেয়ে যাব, কি বলিস মণি?

মণি বলল—বুড়ী যদি দেখে ফেলে?

—কোন্ বুড়ী?

—যার গাছ, সেই বুড়ী।

বুড়ী দেখবে না হাতি। বুড়ী তো থাকে সেই বাগদী পাড়ায়।

—এখন আম পাকেনি বলে আসছে না। পাকলে রোজ বুড়ী আসবে। আড়ি পেতে বসে থাকবে।

—বুড়ীর চোখ দুটো যদি কানা হয়ে যেতো, তাহলে বেশ হতো, কি বলিস?

মুক্তা নুন ছাড়া টক আম কামড় দিয়ে দু'চোখ বুজে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলে উঠল—এ্যাঁ!

মণি বলল—ফেলে দে। বিচ্ছিরি আম।

মুক্তা মুখের আমটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাকী আমগুলোর দিকেও আর কারুর বিশেষ আগ্রহ রইল না। ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে সবাই পা বাড়াল।

পরদিন সত্যি মণিদের চিঠি এল। কিন্তু তাদের ডাকপিয়ন নয়তো। অন্য একটা পিয়ন এল সাইকেলে চড়ে। ক্রীং ক্রীং আওয়াজ করে দাঁড়াল তাদের বাড়ির সামনে।

মণি ও মুক্তা ছুটে এসে সে সাইকেলের সামনে দাঁড়াল। পিয়ন ওদের মাকে বলল কাগজে নাম সই করতে।

মা লিখতে জানে না। সাইকেলের লোকটা আবার সাইকেলে চড়ে রায়বাবুদের বাড়ি চলে গেল। সে বাড়িতে লেখাপড়া জানা লোক আছে। সে বাড়ির ছোটবাবুর হাতে চিঠিটা দিয়ে পিয়ন চলে গেল।

বাদামী রঙের খামে ভরা একটি চিঠি। ছোট-বাবু খুলে পড়লেন। মণি ও মুক্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই দেখল। তারা ভাবতে লাগল—এরকম চিঠি বাবা লিখল কেন? অনেকদিন চিঠি লেখেনি বলেই কি? এখানকার পিয়ন না এসে বড় ডাকঘরের পিয়ন এসে চিঠি দিয়ে গেল?

কিন্তু বাবার চিঠিটা পড়ে ছোটবাবুর মুখ অমন হয়ে গেল কেন? কি লিখেছে তাদের বাবা? মণি ও মুক্তা এগিয়ে গেল আর একটু সামনে।

তাদের দেখে ছোটবাবু বললেন—তোদের মাকে বিকেলবেলা আসতে বলিস আমাদের বাড়ি।

মণি ও মুক্তা দৌড়ে মাকে খবরটা দিতে গেল। সারদার কিন্তু বিকেলবেলা পর্যন্ত দেরি করবার ধৈর্য রইল না। মণি ও মুক্তাকে ভাত খাইয়েই ছুটে গেল রায়বাবুদের বাড়ি।

রায়বাবুদের বড় বৌ সারদাকে ডেকে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর সারদা সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সেই সারদা যেন অন্য মানুষ। কান্নায় চোখ মুখ ফুলে গেছে। চলবার শক্তি নেই। রায়বাবুদের বড় বৌ, সেই বাড়ির ঝি ও একজন চাকর তাকে ধরে নিয়ে এল।

মণি ও মুক্তা কিছুই বুঝতে পারল না। মায়ের এই অবস্থা দেখে ওরাও কাঁদতে লাগল।

কেউ কিছু বলল না। কিন্তু মণির মনে সন্দেহ জাগল। বিকেলবেলা যখন তার মা চান করে এসে লাল পেড়ে শাড়ি ছেড়ে ফেলল, থান ধুতি পরল এবং তাকেও পরিয়ে দিল তখন, বুঝতে পারল তার বাবা মরে গেছে। আর কোনদিন ফিরে আসবে না। গাঁয়ের বলাইর বাবাও এমন করে মরে গেছিল। এমন সাদা কাপড় পরেছিল বলাই।

মুক্তা কিন্তু বুঝল না। মণিকে জিজ্ঞেস করল—বাবার কি হয়েছে রে!

মণি বলল—বাবা মরে গেছে।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—আবার কবে আসবে?

মণির কান্না এল। চোখ মুছতে মুছতে বলল—আর আসবে না।

একটা ভাঙা ছুরি কুড়িয়ে পেয়েছি ইস্কুলের মাঠে।
এই দ্যাখ। [পৃষ্ঠা ৬৫৯

মুক্তার কিন্তু কথাটা বিশ্বাস হল না। সে মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করতে গেল। কিন্তু মায়ের কান্নাভরা চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল মুক্তা। ফ্যাল-ফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সারদা মুক্তাকে কোলে টেনে নিল। মুক্তা চুপ করে মায়ের কোলে বসে রইল।

কয়েকদিন বাদে একজন লোক এল তাদের বাড়িতে। শহরে তাদের বাবা যে দোকানে চাকরি করত, সেই দোকানেরই লোক। লোকটা কয়েকটা টাকা দিল আর কতগুলি ফল দিল তাদের মায়ের হাতে। মায়ের কান্না কিন্তু তাতে আরও বেড়ে গেল।

লোকটা বলল অনেক কিছু। চাকরি চলে যাবার পর তাদের বাবা নাকি দিন রাত ঘুরত। তাতে তার অসুখ করে। তারপর নূতন চাকরি নিয়ে বেশীদিন চাকরি করতে পারেনি।

সেদিনই রাত্রের গাড়িতে লোকটা চলে গেল।

দেখতে দেখতে একটা মাসও কেটে গেল কেমন করে। বাবার শ্রাদ্ধ হল। পুরুত এসে মন্ত্র পড়ল। গাঁয়ের কয়েকজন লোক নিমন্ত্রণ খেল। রায়বাড়ির ছোটবাবুই সব ব্যবস্থা করলেন।

এরপর থেকে মণি ও মুক্তা বুঝতে পারল, তাদের বাড়িটা যেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। ভোরবেলায় মা মুড়ি খেতে দেয় না। দুপুরবেলায় রান্না করে শুধু ভাত আর শাক সিদ্ধ। কোনদিন আবার রান্নাই করে না।

সেদিন যে কি খারাপ লাগে মণি ও মুক্তার। খিদেয় তাদের পেট জ্বলতে থাকে। শেষে সইতে না পেরে কেঁদে ফেলে দু'জনেই। বাবা মরে গেলে কেন এমন হয়? এর কারণ কিছুই তারা বুঝতে পারে না।

রায়বাড়ি থেকে কোনদিন ভাত আর তরকারি আসে। ওদের বাড়ির কালো ঝিটা পাতায় করে নিয়ে আসে। সেদিন দু'জনেই খুব মজা করে খেতে পারে। মা কিন্তু প্রায় সবগুলোই দিয়ে দেয় তাদের। দু' মুঠো ভাত শুধু মা নিজের জন্য রাখে, কোনদিন তাও রাখে না।

মুক্তা জিজ্ঞেস করে—মা, তুমি খাবে না?

মা ছলছল চোখে জবাব দেয়—না, তোরাই খা, আমার খিদে পায়নি।

মুক্তা বলে—তুমি যে কিছু খাওনি, খিদে পায়নি কেন?

মা আঁচলে চোখ মুছে জবাব দেয়—আমার শরীরটা ভাল না।

মুক্তা বুঝতে পারে না তাদের মা সব সময়েই কাঁদে কেন? মণিকে জিজ্ঞেস করে—মা এত কাঁদে কেন রে?

মণি জবাব দেয়—বাবা যে মরে গেছে সেজন্যে!

মুক্তা বলে—বাবা আবার এলে মা কাঁদবে না?

মণি বলে—দূর বোকা! কি করে আসবে?

মুক্তা বলে—গাড়ি করে আসবে।

মণি বুঝতে পারে, মুক্তাকে বোঝালেও বুঝবে না। তাই বলে—হ্যাঁ, আসবে। তখন মা আর কাঁদবে না।

দুপুরবেলায় চুপি চুপি আসে মানু আর বাদল। বলে—চল, কাঁচা আম খাইগে। ভূতো গাছের আম কি বড় বড় হয়েছে।

মণি কিন্তু তার আম-কাটা ঝিনুকটা খুঁজে পায় না। বাদল বলে—থাক, ঝিনুক লাগবে না। আমি একটা ভাঙা ছুরি কুড়িয়ে পেয়েছি ইস্কুলের মাঠে। এই ছাখ। এটাতেই হবে।

মণি বলিল—দেখি তো, কি রকম?

একটা বাঁট ছাড়া ভাঙা ছুরি বাদল দিল মণির হাতে।

মণি ধার পরখ করে বলল—ধার আছে তো রে খুব।

বাদল বলল—ধার কি এমনি হয়েছে? শিল নোড়ার উপর এটাকে খুব করে ঘষেছি।

চুপি চুপি সবাই চলল আমতলার দিকে।

কিন্তু পুকুরটা ছাড়িয়ে পথের একটু বাঁক ঘুরেই তারা ধীরে ধীরে চলতে লাগল। আমতলার কাছটা আজকে যেন বেশী থমথমে মনে হচ্ছে। অন্ধকার ঘুটঘুটে করছে যেন আরও বেশী।

বাদল বলল—ওখানে আজকে ভূত আছে রে।

কানু বলল—যা, আমরা চারটে লোক আছি, ভূতে কি করবে?

বাদল বলল—যদি বড় ভূত থাকে? সেই তেঁতুল ঝোড়ার খালে যে ভূতটা ঘুরে বেড়ায়?

কানু বলল—আয়, ভূতের মন্ত্র বলেনি, তাহলেই ভূত পালিয়ে যাবে।

সবাই তখন বলতে শুরু করল—

ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি,
রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে,
করবি তোরা কি?

বাদল বলল—আবার বল। তিনবার বলতে হয়।

আরো দুবার সবাই আওড়িয়ে নিল।

এবার বীরের মত পা ফেলে চলতে লাগল সবাই। পথের থেকেই মাটির ঢেলা আর ভাঙ্গা খোলা যোগাড় করে নিল। ঢিল ছুঁড়ে কয়েকটা আম সবে মাত্র পাড়া হয়েছে, মুক্তা কুড়িয়ে নিয়েই থমকে দাঁড়াল। হিজল গাছটার সোজাসুজি একটু দূরে দৃষ্টি পড়ল তার। একটা ভূতের মতন কি যেন আসছে।

মুক্তা বলল—ছাখ, ঐ ছাখ।

সবাই চেয়ে দেখল। সাদা কাপড় পরনে, পাকা চুল মাথায়—জঙ্গলের ওপাশ দিয়ে কি যেন এগিয়ে আসছে।

বাদল বলল—দেখলি, আমি বলেছিলাম না?

মুক্তা বলল—দাদা, আমি বাড়ি চলে যাব।

মণির বুকটাও ধড়ফড় করে উঠল। সে কোন কথা বলল না। কানু বলে উঠল—দূর, ওটা ভূত নয়, পেত্নী।

—এঁ্যা। আঁতকিয়ে উঠল সবাই।

কানু বলল—হ্যাঁ, দেখছিস না, পাকা লম্বা লম্বা চুল, মেয়েদের মত কাপড় পরা। এটা যে সেই বুড়ী রে। আম গাছ পাহারা দিতে এসেছে।

বাদল বলল—আম না পাকতেই এসে গেল বুড়ী। কেউ নিশ্চয় ওকে বলে দিয়েছে। চল দৌড়ে চল।

দৌড় দেবার আগেই বুড়ী হনহন করে ছুটে এসেছে। মুখ দিয়ে অনর্গল গালি বেরুচ্ছে।—ওরে পোড়ারমুখোরা, ওরে ছাইখেকোরা—আয় তোদের আম খাওয়াচ্ছি।

কিন্তু পোড়ারমুখো আর ছাইখেকোরা তখন বেদম ছুটতে শুরু করেছে। বুড়ী হাঁপিয়ে উঠল। নিরুপায় হয়ে বসে পড়ল আমগাছতলায়। আর পলায়মান ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে ওদের মুণ্ডপাত করতে শুরু করল। (ক্রমশঃ)

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

মণি ও মুক্তা যখন চুপি চুপি বাড়ি ঢুকল, তখন দেখল, তাদের দাওয়ায় কে একজন লোক বসে আছে। কাছে এসে চিনতে পারল—গদাধর। তাদের গাঁয়েরই লোক। স্টেশনে চায়ের দোকান আছে। বসে বসে ওদের মায়ের সঙ্গে কথা বলছে।

কাছে আসতেই গদাধর মণিকে ডাকল। মণি গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই গদাধর বলল—কি রে মণি, চায়ের দোকানে কাজ করতে পারবি?

মণির মাথায় যেন বাজ পড়ল। বলে কি লোকটা? সে ভয়ে ভয়ে মায়ের মুখের দিকে চাইল। মায়ের মুখ যেন ফ্যাকাশে মনে হল। কোন লাবণ্য নেই, কোন দীপ্তি নেই। মুখ নীচু করে বসে রইল মা।

গদাধর বলল—বেশী কিছু কাজ করতে হবে না। খদ্দের এলে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে হবে আর কাপ-ডিসগুলো জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পারবি না?

মুখ দিয়ে কথা বেরুল না মণির। ওর হয়ে ওর মা ধীরে ধীরে জবাব দিল—পারবে। না পেরেই উপায় কি? খাবে কি?

গদাধর বলল,—বেশ, বেশ। আজ থাক। কাল ভোরবেলায় এসে নিয়ে যাব। সকাল সকাল উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ঠিকঠাক হয়ে থাকিস, বুঝলি মণি?

গদাধর চলে গেল। মণি নির্বাক্ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল! মুক্তা এতক্ষণ শুধু কথাই শুনছিল। এবার জিজ্ঞেস করল—মা, দাদা কোথায় যাবে?

সারদার দু'চোখ ভরে জল এল। মুক্তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলল—চাকরি করতে যা'বে।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—বাবার মতন চাকরি করতে যাবে?

সারদা ওকে আরও জোরে বুকে চেপে নিয়ে বলল—হ্যাঁ রে।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—কেন?

সারদা বলল—যাবে না? তোমার দাদা যে বড় হয়ে গেছে।

মুক্তা বলল—তা হলে আমাকে কে আম পেড়ে দেবে মা?

এবার আর জবাব দিতে পারল না সারদা। মুক্তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল।

মণি শান্ত ছেলের মত মায়ের কাছ ঘেঁষে বসল। ভাবল সে বেশী দুষ্টুমি করে বলেই বুঝি মা তাকে

চাকরি করতে পাঠাচ্ছে। ধীরে ধীরে বলল—মা, আমি আর দুষ্টুমি করব না।

অশ্রুভরা চোখে সারদা চাইল ছেলের দিকে। বলল—চাকরি না করলে খাবি কি বাবা?

মণি জিজ্ঞেস করল—চাকরি করলে ওরা খেতে দেবে?

সারদা বলল—হ্যাঁ, তোকে খেতে দেবে, টাকা দেবে।

মণি জিজ্ঞেস করল—ক'টাকা?

সারদা বলল—তিন টাকা।

মণি হাতের তিনটি আঙুল দেখিয়ে বলল—তিন টাকা? এক—দুই—তিন।

দুঃখের মাঝেও বুঝি একটু সান্ত্বনার আভাষ পায় মণি। সারদাও।

পরের দিন ভোরবেলাতেই আসে গদাধর। মণির মনটা কেমন করে ওঠে। যেতে ইচ্ছা করে না। চোখ মুছতে মুছতে মায়ের কাছ ঘেঁষে বসে।

সারদা বেতের কাঠায় করে মুড়ি খেতে দেয় মণিকে। বলে—যা বাবা, দু'টো খেয়ে যা। আবার সন্ধ্যাবেলাই তো চলে আসবি।

গদাধর বলে—হ্যাঁ। সন্ধ্যার পরে তো আমার সঙ্গেই চলে আসবি দোকান থেকে। দুপুরবেলাও মাঝে মাঝে ছুটি পাবি।

অনিচ্ছুক ছাত্রকে যেমন করে পাঠশালায় পাঠানো হয় তেমন করেই গদাধর ধরে নিয়ে গেল মণিকে।

কিছু দূর গিয়ে বারে বারে পেছনে ফিরে চায় মণি। মনে হয় কত দূরে বিদেশে যাচ্ছে।

সারদা আঁচলে চোখ মোছে। মুক্তার চোখেও জল আসে।

সমবয়সী বন্ধুদের কিন্তু খবর পেতে দেরি হয় না। একটু বেলা হলেই আসে কানু আর বাদল। জিজ্ঞেস করে—মণি চলে গেছে নাকি রে?

মুক্তা জবাব দেয়—হ্যাঁ, বাবার মতন চাকরি করতে চলে গেছে।

বাদল বলে—হ্যাঁ, তার বাবার মত না হাতি। মণি তা ইস্টিশনে চায়ের দোকানে গেছে।

পাখিটার পেছনে পেছনে ছুটল কানু আর বাদল। [পৃষ্ঠা ৭২৮

মুক্তা বলে—দাদা রোজ গাড়ি দেখতে পাবে, না রে?

কানু বলে—হ্যাঁ।

মুক্তা বলে—বাবা যে গাড়িতে আসবে সেই গাড়িও দেখবে।

বাদল ও কানু দু'জনেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে—ওমা, বলে কি! ওর বাবা আসবে!

মুক্তা যেন একটু ঘাবড়িয়ে যায়।

বাদল চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে—সেই আম কাটা ঝিনুকটা মণি তোর কাছে রেখে গেছে, হ্যাঁ রে?

মুক্তা জবাব দেয়—না তো। ঘরেই আছে। খুঁজে দেখব?

বাদল বলে—খুঁজে রাখিস। দুপুরবেলায় আসব। যাবি আমাদের সঙ্গে আমতলায়?

মুক্তা ঘাড় নেড়ে বলে—হ্যাঁ যাব।

সারদা তখন পুকুরঘাট থেকে ফিরছে। কাঁখে জল ভরা কলস। তাকে দেখে সকলেই চুপ করল। কিছুক্ষণ পর বাদল চুপি চুপি বলল—ঝিনুকটা খুঁজে রাখিস কিন্তু। আমরা লঙ্কার গুঁড়া আর নুন নিয়ে আসব।

—তোর সেই ছুরিটা কি হয়েছে রে ?

—হারিয়ে গেছে।

এমন সময় পাখির কিচির মিচির শব্দ শুনে সবাই তাকাল দূরের কাঁঠাল গাছটার দিকে। দু'টো টিয়ে পাখিতে ঝগড় লেগেছে। একটা পাখি ছটফট করতে করতে পড়ে গেল নীচে। কানু আর বাদল সেদিকে ছুটে গেল। কিন্তু পাখিটাকে ধরতে পারা গেল না। কাছে যাবার আগেই সেটা আবার উড়ে পালিয়ে গেল। পেছনে পেছনে ছুটল কানু আর বাদল। পাখিটা একটা আমগাছে গিয়ে বসল।

কানু বলল—ছাখ রে, ওটা যেন কাদের পোষা পাখি, পালিয়ে এসেছে।

বাদল বলল—হ্যাঁ, তাই তো রে! পাখায় হলুদ মাখা।

দু'জনেই দাঁড়িয়ে রইল। চুপি চুপি লক্ষ্য রাখল পাখিটার দিকে। মুক্তাও এদিকে তাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করল—পাখি ধরতে পারলি না ?

বাদল ও কানু এক সঙ্গে মুখের উপর আঙুল রেখে বলল—চুপ, শব্দ করিস নে।

কিন্তু শব্দ করবার আগেই পাখি সে গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে চলে গেছে।

বাদল বলল—মুক্তার জন্যই সব মাটি হয়ে গেল। পাখিটা পালিয়ে গেল।

মুক্তা বলল—পাখিটা ধরতে পারলে আমাকে দিবি তো ?

কানু বলল—ইস, তোকে দেব না, হাতি।

মুক্তার মন দমে গেল। তবু সেখান থেকে সরল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

পাখিটা বোধহয় অন্য পাখির সঙ্গে ঝগড়া করে জখম হয়েছে। আবার উড়ে এসে নীচে বসল। সেই সুযোগে চালাক বাদল ধরে ফেলল পাখিটাকে। কিন্তু টিয়ে পাখির ঠোঁট বড় ধারাল। বাদলের হাতটাকে ও কামড়িয়ে জখম করতে ছাড়ল না।

বাদল দু'আঙুলে জোর করে চেপে ধরল আর কানু গুলঞ্চ লতা এনে জড়িয়ে বেঁধে ফেলল ঠোঁটটাকে। তারপর সেটাকে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। বাদলদের বাড়িতে একটা বড় খাঁচা আছে, পাখিটাকে সেখানেই পুরে রাখবে।

মুক্তাও হেঁটে ওদের পেছনে পেছনে চলল।

পাখি না পাওয়ায় মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল ওর।

সেদিন থেকে কিন্তু পাখির উপর ভয়ানক ঝোঁক বেড়ে গেল মুক্তার। ভাবল, দাদা এলেই পাখি ধরে দেবার কথা বলবে।

সন্ধ্যার পর মণি এল। মুক্তা বলল—দাদা, বাদল আর কানু কি সুন্দর একটা টিয়া পাখি ধরেছে। আমাকে একটা ধরে দিবি ?

মণি জিজ্ঞেস করল—কি করে ধরল রে ?

মুক্তা বলল—একদম নীচে বসেছিল, বাদল খপ করে ফেলেছে।

—পাখিটা কাদের বাড়িতে আছে রে ?

—বাদলদের বাড়ি। খাঁচায় পুরে রেখেছে।

মণি পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলল বাদলদের বাড়ির দিকে পাখিটাকে দেখতে। একটু বেলা হলেই তাকে চলে যেতে হবে ইস্টিশনে, চায়ের দোকানে। কাজেই মুক্তাকে না ডেকে একা একাই সে চলল।

বাদলদের বারান্দায় ঝুলছে পাখির খাচা। মণি কাছে যেতেই টি-টি করে ডেকে উঠল পাখিটা। বাদল সাড়া পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বলল—ছাখ মণি, কি সুন্দর পাখি ধরেছি।

মণি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল পাখিটার দিকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই আবার চলে এল। স্টেশনে যাবার দেরি আর বেশীক্ষণ নেই।

ভোরে মুক্তা ঘুম থেকে উঠবার আগেই রোজ ছেঁড়া ময়লা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে মণি বের হয়। গেঁয়ো

পথ দিয়ে হাঁটতে থাকে স্টেশনের দোকানের দিকে। পা চলতে চায় না। তবু চলতে হয়। দেরি হলে আবার বকবে দোকানদার।

দোকানে খদ্দের এলেই জিজ্ঞেস করতে হয়—কি লাগবে বাবু? চা আর মামলেট? না চা আর বিস্কুট?

ফরমাস নিয়ে বলতে হয় দোকানের কারিগরকে। কারিগর মণির হাতে তুলে দেয় চায়ের কাপ আর ডিস। মণি সন্তর্পণে এগিয়ে যায় খদ্দেরের দিকে। অতি সাবধানে ধরে চায়ের কাপ আর ডিস। পা ফেলে অতি সন্তর্পণে।

এই হল মণির কাজের তালিকা।

তবু সময় সময় মুখ ঝামটা শুনতে হয় গদাধরের। ধমক দিয়ে বলে—হেই, কাজ কর একটু হাত চালিয়ে।

আবার কোন সময় চেঁচিয়ে বলে—দেখিস, ভেঙে ফেলিস না যেন কাপ।

সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে স্টেশনের কাছে বাজারে। সেদিন মণির খুব খাটুনি হয়। দোকানে খদ্দের হয় বেশী। অন্য দিন দুপুরের আগে ছুটি পায় মণি। খেয়ে-দেয়ে বাড়িতে চলে আসে। আবার বিকেলে গাড়ি আসার আগেই দোকানে ফিরে যায়। সেদিন অবশ্য বাড়ি ফিরতে একটু রাত হয়।

প্রথম প্রথম খুবই খারাপ লাগত মণির। কান্না পেত। তারপর ধীরে ধীরে সয়ে গেছে। তবু সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝেই ঘুম পায়। কাঠের বেঞ্চিটার এক ধারে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়তে চেষ্টা করে মণি। কিন্তু গদাধরের ধমকে চমকে ওঠে।

চেঁচিয়ে ওঠে গদাধর—হেই উল্লুক, সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোয় না, দোকানে অলক্ষ্মী ঢুকবে।

মণি জড়সড় হয়ে উঠে পড়ে।

একদিন দুপুরবেলায় অকারণে অনেকগুলো বকুনি খেল মণি। সেদিন হাটবার ছিল না। দুপুরে বাড়ি ফিরবার জন্য মনটা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এমন সময় গদাধর বলল—উনুনের ছাইগুলো থেকে পোড়া কয়লা বের কর ত মণি।

মণি বলল—বাড়ি থেকে এসে বের করব।

অমনি প্রকাণ্ড এক ধমক দিয়ে বলল গদাধর—পাজি, হতভাগা, কথার অবাধ্য হচ্ছিস?

তারপর বকুনি শুরু হল।

—চাই না তোকে। আজই বেরিয়ে যা।

কান্না পেল মণির। তবু কাজ করতে হল। ছল ছল চোখ মুছতে মুছতে দেরি করেই বাড়ি ফিরে চলল মণি।

পথে চলতে চলতে মণি একটা ঝোপের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। একটা ছোট শালিকের বাচ্চা গাছের নীচে চুপ করে বসে আছে। মণি কাছে এগিয়ে গেল। উড়তে গিয়েও আবার সেখানেই বসে রইল বাচ্চাটি। হয়তো ডানা ভেঙে গেছে। আরো এগিয়ে গিয়ে মণি সেটাকে ধরে ফেলল।

শুকিয়ে গেল মণির চোখের জল। মনের সমস্ত দুঃখ যেন এক নিমেষে উড়ে গেল। চায়ের দোকানের বকুনির কথা আর একটুও মনে রইল না। বাচ্চাটিকে নিয়ে আনন্দে ছুটতে ছুটতে বাড়ি চলল। মুক্তা যে কত খুশী হবে বাচ্চাটিকে দেখে! অবাকও হয়ে যাবে খুব।

মুক্তার আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে মণি বাড়ি চলল। বাড়ির কাছে এসে তাকাতে লাগল এদিক ওদিকে। মুক্তা কোথাও দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখতে লাগল।

না, কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। মুক্তোটা যে কি! এত আনন্দের ব্যাপারটা দেখবার জন্য ছুটে আসছে না?

মণি বাড়িতে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। কারুর সাড়া শব্দ নেই। ঘরে ঢুকে দেখল, মা আর মুক্তা ঘুমিয়ে আছে।

মণি ডাকল মুক্তাকে—ঐ মুক্তা, ওঠ। ত্যাখ কি এনেছি।

মুক্তা উঠল না। আবার ডাকল মণি—ওঠ, ত্যাখ, পাখির বাচ্চা ধরে এনেছি।

মুক্তা ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল।

মণি বলল—তুই পাখিটাকে ধর, আমি খাঁচাটা পেড়ে আনছি।

মুক্তা বলল—আমি ধরতে পারব না, হাত থেকে উড়ে যাবে।

মণি বলল—উড়তে পারবে না, ডানা ভাঙা।

—যদি আমাকে ঠোকরিয়ে দেয়?

—তবে ধামাটা নিয়ে আয়, চাপা দিয়ে রাখছি।

মুক্তা চৌকির নীচ থেকে ধামা নিয়ে এল। পাখিটা চাপা দিয়ে মণি উঠল রান্নাঘরের চালায়। অনেক দিনের পুরনো একটা খাঁচা চালার উপর তোলা ছিল। সেটা পেড়ে নিয়ে এল।

মুক্তার মনে কি আনন্দ!

মণি বলল—একটু চুন নিয়ে আয় তো। বাচ্চাটার পায়ে লাগিয়ে দিই।

মুক্তা চুন নিয়ে এল। ভাঙা ডানাটায় চুন লাগিয়ে দিল মণি। তারপর সন্তর্পণে পাখিটাকে খাঁচায় পুরে ফেলল।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—দাদা, পাখি কি খাবে?

মণি বলল—ভাত খাবে, গঙ্গাফড়িং খাবে। আজ না হয় নারকেলের মালায় করে একটু ভাত দে। কাল ওর জন্য গঙ্গাফড়িং ধরে নিয়ে আনব।

সারদার শরীরটা খুব ভাল ছিল না। ছেলেমেয়ের চেঁচামেচি শুনে বিছানা ছেড়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। পাখিটাকে দেখে জিজ্ঞেস করল—কি পাখি ধরেছিস?

—শালিক পাখি।

—শালিক পাখি পুষে কি হবে রে? ওটা ছেড়ে দে।

—না মা, ওটাকে পুষব।

—গান গাইবে না, শিস দেবে না। এটাকে রেখে কি হবে?

—তবু থাক। বাচ্চাটার যে ডানাভাঙা। ছেড়ে দিলেও যেতে পারবে না।

মুক্তা একটা নারকোলের মালা কুড়িয়ে এনে মায়ের কাছে দাঁড়াল। বলল—মা, দুটো ভাত দাও না, পাখিটাকে দেব!

সারদা বলল—ভাত কি আর আছে? দ্যাখ হাঁড়িটার তলায় কিছু পড়ে আছে কি না।

অনুমতি পেয়ে মুক্তা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। হাঁড়ি থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এল সামান্য কয়েকটা ভাত। এসে বলল—দাদা, আর ভাত নেই।

মণি বলল—থাক, এতেই হবে। জল নিয়ে আয়।

সব ব্যবস্থা করে খাঁচাটাকে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বেলা গড়িয়ে গেল। মণির আর দেরি করা চলে না। এখনই চায়ের দোকানে যেতে হবে।

যাবার সময় মুক্তাকে বলে গেল—দেখিস, খাঁচাটাকে নীচে নামিয়ে রাখিস না। বেড়ালে ধরবে।

কিন্তু দোকানে গিয়েও মণি পাখিটার কথা ভুলতে পারল না। থেকে থেকেই শুধু মনে পড়তে লাগল।

রাত্রিতে যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন মুক্তা ঘুমিয়ে পড়েছে। মণি দাওয়ায় পা দিয়েই পাখিটাকে দেখতে ছুটে গেল। পাখিটা খাঁচার এক কোণে জড়সড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে। মণির সাড়া পেয়েই জেগে উঠল। খাঁচাটার চারদিকে ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে দিয়ে মণি ঘুমুতে গেল।

পরদিন একটু সকাল সকালই দু'জনে ঘুম থেকে উঠল। উঠেই ছুটে গেল পাখিটার কাছে। পাখিটা চুপচাপ বসে আছে।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—পাখিটা খালি বসে আছে কেন রে দাদা?

মণি বলল—পা সেরে গেলেই উঠে লাফাবে।

মুক্তা বলল—দাদা, গঙ্গাফড়িং আনবি না?

মণি বলল—হ্যাঁ, চল যাই! বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে।

দু'জনেই গঙ্গাফড়িংয়ের খোঁজে মাঠের দিকে চলে গেল।

সেদিন চায়ের দোকানে যেতে দেরি হল মণির। কিন্তু সেজন্য খুব বকুনি খেতে হল। গদাধর শুধু মারতে বাকী রাখল মণিকে।

কাঁদো কাঁদো চোখেই মণি কাজ করতে লাগল। দু'জন ভদ্রলোক চা খেতে বসেছিলেন। তাঁদের সামনে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে এল। একজন ভদ্রলোক ছিলেন খুবই ভাল। মণির অবস্থা দেখে তাঁর খুব দয়া হল। চা খাওয়া হয়ে গেলে দাম মিটিয়ে বাড়তি চারটি পয়সা মণিকে দিতে হাত বাড়ালেন!

কিন্তু মণির কি সংকোচ আর ভয়। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভদ্রলোক বললেন—নাও না হে, তোমাকে দিলাম।

মণি তাকাল তার মহাজন গদাধরের দিকে। গদাধর তখন খাতায় হিসেব লিখছে।

মণি বলল—না, নেব না।

ভদ্রলোক বললেন—আহা, একি সত্যি তোমাকে দিলুম? ঘরে তোমার ছোট ভাইবোন আছে তো? তাদের বিস্কুট কিনে দিও।

মণি এবার সাহসে হাত বাড়িয়ে পয়সাটা নিল। কিন্তু বুকটা দুরদুর করতে লাগল। পরের পয়সা নিতে গেলে বুঝি এমনই হয়।

দুপুরবেলায় বাড়ি ফিরে মণি সেই এক আনা পয়সা জমা রেখে দিল মায়ের কাছে। বলল—চড়ক পূজার মেলা থেকে পুতুল কিনে দেব মুক্তাকে।

মুক্তা ভারী খুশী। জিজ্ঞেস করল—চড়ক পূজার মেলা কবে হবে মা?

সারদা বলল—আর বেশীদিন নেই। দশ বারো দিন বাকী।

মুক্তা বলল—বাঃ, কি মজা! বাবা আসবে না মা?

সারদার মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। দু'চোখ জলে ভরে এল। মণি তা বুঝতে পেরে ধমক দিল মুক্তাকে। বলল—যাঃ, বাবা আসবে কোত্থেকে রে?

মুক্তা গম্ভীর হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর সেই থমথমে আবহাওয়াটা হালকা করল মুক্তা। বলল—দাদা, তুই আমাকে পুতুল কিনে দিবি তো?

মণি বলল—হ্যাঁ দেব।

মুক্তা বলল—সেই রঙ দেওয়া মাটির পুতুল। অন্য পুতুল আমি নেব না।

সারদা মুক্তাকে চুমু খেয়ে বলল—হ্যাঁ, তোমাকে রাঙা টুকটুকে পুতুল কিনে দেবে তোমার দাদা। তোমার দাদা চারটে পয়সা দিয়েছে, আমি তোমাকে আরো চারটে পয়সা দেব।

মুক্তা আরো খুশী হয়ে উঠল। বলল—আমার অনেক পয়সা হবে, আমি তাহলে টোপা কিনব—হাঁড়ি, কড়াই, কলসী সব কিছু।

সারদা বলল—আচ্ছা, সব কিনবে।

মুক্তা পাখির কথা প্রচার করে দিয়েছিল সারা গাঁয়ে। কাজেই কানু, হারু, বাদল, ইঁদু সবাই এল পাখিটাকে দেখতে। কিন্তু একরত্তি রোগা পাখিটাকে দেখে খুশী হল না কেউ। বাদল বলল—তোদের পাখিটা একটুও ভাল না। আর আমাদের পাখিটা কি সুন্দর!

কানু বলল—রোগা পটকা ডানা ভাঙা পাখি। কেমন বিচ্ছিরি দেখতে।

মুক্তা কাঁদো কাঁদো মুখে দাদার দিকে তাকাল। মণি বলল—ইস আমাদের পাখি ভাল। পা সেরে গেলে পাখা গজালে, আরও ভাল দেখাবে।

বাদল বলল—ভাল দেখাবে না, হাতি দেখাবে।

মুক্তা জিভ বের করে ভেংচি কেটে বলল—উ-উ-উ।

সঙ্গে সঙ্গে বাদল, কানু, হারু সবাই ভেংচি কাটতে লাগল। মণি এবার তেড়ে গেল সবাইকে।

দূরে গিয়ে ওরা সুর করে বলতে লাগল—তোদের পাখি খারাপ, আমাদের পাখি ভাল।

মণিও পাল্টা জবাব দিতে লাগল—তোদের পাখি খারাপ, আমাদের পাখি ভাল।

বাদল বলল—তোদের পাখির পা ভাঙা, মরে যাবে।

এবার মণি ক্ষেপে উঠল। ঢিল তুলে তেড়ে গেল তাদের দিকে। সবাই ছুটে পালিয়ে গেল।

মণি যখন ঢিল ছুড়ল তখন তারা ঢিলের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

যে ভদ্রলোক মণিকে পয়সা দিয়েছিলেন, সে ভদ্রলোক আবার একদিন এলেন চা খেতে। দোকানে তখন গদাধর ছিল না। ভদ্রলোক মণিকে কাছে

ডেকে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কি খোকা?

—মণি।

—থাকো কোথায়?

—ঐ গাঁয়ের ভেতরে।

—তোমার বাবা কি করেন?

—বাবা নেই।

—আর কে আছে বাড়িতে?

—মা আছে আর ছোট বোন মুক্তা।

ভদ্রলোকের মনে ভারী দুঃখ হল মণির কথা শুনে। জিজ্ঞেস করলেন—আমাদের বাড়ি যাবে?

মণি জিজ্ঞেস করল—কোথায়?

—সেই বর্ধমান শহরে। আমি তো সেখানেই থাকি। এখানে মাঝে মাঝে আসি কোন কাজে।

মণি বলল—বর্ধমান যে অনেক দূর।

ভদ্রলোক বললেন—দূর আর কোথায়? দুপুরের গাড়িতে উঠলে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে।

মণি বলল—ওখানে গিয়ে কি করে খাব?

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

মণি বলল—মা আর মুক্তার জন্য মন কেমন করবে যে।

ভদ্রলোক বললেন—তোমার মা আর মুক্তাও যদি যায়।

মণি বলল—তাহলে যাব।

ভদ্রলোক সেদিনও চারটি পয়সা মণিকে দিলেন। মণি বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে সব কথা বলল। সারদা বলল—ভদ্রলোক বুঝি তোকে খুব ভালবাসে, না রে?

মণি বলল—হ্যাঁ মা, লোকটা খুব ভাল। যাবে মা ওদের বাড়ি?

সারদা বলল—আর একটু বড় হয়ে নে। যাস ওদের বাড়ি বেড়াতে। আমাকেও একদিন নিয়ে যাস।

মণি ভাবে—লোকটা বুঝি তাদেরই আপনার লোক। কত লোকই তো রোজ আসে চা খেতে, কিন্তু সবাই তো তাকে পয়সা দেয় না। এমন আদর করে ডাকে না। আর এই দোকানের লোকটা তো আরও খারাপ ব্যবহার করে তার সঙ্গে। এমন কেন হয়? একটা লোক ভাল, একটা লোক খারাপ হয় কেন?

মণি এর কোন কারণই খুঁজে পায় না।

(ক্রমশঃ)

—

উমেদার। চাকরি চাই।

থাকা খাওয়ার
বিনিময়ে ইঁদুর
মারিয়া দিব!

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

৪

একদিন ভোরবেলা ঘটল এক দুর্ঘটনা। মণি ও মুক্তার কাছে পৃথিবীটাই যেন বদলে গেল। ঘুম থেকে উঠে মণি দেখল—শালিকের বাচ্চা খাঁচার ভেতর যেন কেমন হয়ে পড়ে আছে।

সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাকল মুক্তাকে—মুক্তা, ওঠ ওঠ।

মুক্তা ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল। খাঁচার কাছে দুজনে এসে নেড়েচেড়ে দেখল—পাখিটা মরে গেছে।

মুক্তা কেঁদে উঠল। সারদা ছুটে এসে বলল—কি হয়েছে রে?

—পাখিটা মরে গেছে। বলে মুক্তা আরও কাঁদতে লাগল।

মণি চেঁচিয়ে না কাঁদলেও কান্নায় ওর দু চোখ জলে ভরে এল। কিন্তু তার চেয়েও বেশী হল জেদ আর ক্রোধ। বলল—আজ আমি বাদলকে মারব।

সারদা বলল—কেন, কি করেছে বাদল?

মণি বলল—ও আমার পাখি মরে যাবে বলেছিল কেন?

সারদা বলল—মরে যাবে বললেই কি পাখি মরে যায়? ওটার অসুখ হয়েছিল।

মণি বলল—না, ও বলল কেন? আমি ওকে আজ মারবই।

সারদা বলল—ছিঃ, ওসব কথা বলে না। পাখির কি অভাব আছে দেশে? আমি একদিন একটা ধরে দেব।

মুক্তা বলল—ধরে না দাও যদি?

সারদা বলল—চড়কের মেলা থেকে চার পয়সা দিয়ে একটা পাখি কিনে দেব।

—জ্যান্ত পাখি দেবে তো?

—হ্যাঁ।

মুক্তা এবার শান্ত হল। মণিও আশ্বস্ত হল একটু। চড়কের মেলা থেকে তারা পাখি কিনবে। ভাল দেখে একটা পাখি। চড়কের মেলার আর

দেরি নাই। তিন চার দিন মাত্র বাকী। মেলার আনন্দের কল্পনা যেন এই দুঃখটাকে হালকা করে দিল।

মেলার দিন খুব ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠল মুক্তা। তার মনে কি আনন্দ! বিকেলবেলা মেলা দেখতে যাবে। কতকিছু কিনবে মেলা থেকে। কিন্তু মণির মনের আনন্দ একেবারেই উবে গেল। সে ভেবেছিল মেলার দিন ছুটি পাবে। দোকানে যেতে হবে না। কিন্তু সেদিনও তাকে যেতে হল। বরং অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই যেতে হল। গদাধর আগেই বলে দিয়েছে—সেদিন দোকানে খদ্দেরের ভিড় বেশী হবে—কাজেই সকাল সকাল আসতে হবে।

মুক্তা জিজ্ঞাসা করল—দাদা, মেলায় কার সঙ্গে যাব?

মণি বলল—আমি ছুটি নিয়ে আসব। দেরি হলে তুই মায়ের সঙ্গে চলে যাস।

—মা যদি না যায়?

—যাবে। হ্যাঁ মা, তুমি যাবে না? সারদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মণি।

সারদা জবাব দিল—হ্যাঁ যাব। তুই তোদের মহাজনকে বলে সকাল সকাল চলে আসবি। সবাই যাব এক সঙ্গে।

মুক্তা বলল—দাদা, তুই যে বলেছিলি তোর পয়সা দিয়ে আমাকে পুতুল কিনে দিবি।

মণি বলল—হ্যাঁ, সত্যি কিনে দেব।

মার দিকে চেয়ে মুক্তা বলল—আর একটা পাখি কিনে দেবে না মা? তুমি যে বলেছিলে?

মণি বলল—না পাখি কিনতে হবে না। আমি আর একটা পাখি ধরে দেব।

—যদি ধরতে না পারিস?

—হ্যাঁ, খুব পারব।

মণি তাড়াতাড়ি কাজে চলে গেল।

কিন্তু দোকানে গিয়েও তার মন ছটফট করতে লাগল। মনটা পড়ে রইল মেলার দিকে। কখন মেলা শুরু হবে, মুক্তাকে নিয়ে গিয়ে পুতুল কিনে দেবে, তাই শুধু ভাবতে লাগল। মুক্তা যে ওর আশায় বসে থাকবে।

কিন্তু যদি ছুটি না পাওয়া যায়? যদি ওকে যেতে না দেয় গদাধর? মুক্তা হয়তো কেঁদে ফেলবে। কিন্তু ওর নিজেরই কি ভাল লাগবে? মেলার মজাটাই যাবে মাটি হয়ে। সে কথা ভাবতে এখনই কান্না পেতে লাগল মণির।

সেই ভদ্রলোকটি আজও এলেন। আজও চারটি পয়সা দিলেন মণিকে। বললেন—মেলা থেকে কিছু কিনে খেয়ো মণি।

মণি সেই পয়সা যত্নে আঁচলে বেঁধে রাখল। কিছু কিনে সে খাবে না। পুতুল কিনে নেবে মুক্তার জন্য। যাবার সময় মেলা থেকে পুতুল কিনে নিয়ে বাড়িতে উঠবে। অবাক্ হয়ে যাবে মুক্তা।

কিন্তু দুপুরের পর থেকেই দোকানে খদ্দেরের ভিড় একটু একটু বাড়তে লাগল। গদাধর বলল—আজ কেউ ছুটি পাবে না। মেলার শেষে রাত্তির বেলায় সবাই বাড়ি যাবে।

মণির মন ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। কান্না পেল তার। মনে হল সারা পৃথিবীটাই বুঝি কালো হয়ে এল তার সামনে।

স্টেশন থেকে মেলা দেখা যায়। বিকেলবেলা মেলাটা খুব জমে উঠল। নাগর দোলা ঘুরতে লাগল। ঢাক ঢোল আর বাঁশীর শব্দে ভরে উঠল চারদিক। মণির এবার কান্না পেল।

একটু পরে একজন লোক এল। গদাধরকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে। গদাধর বলল—আমার আসতে একটু দেরি হবে। তোরা দেখে শুনে খদ্দেরকে দিস।

গদাধর চলে গেলে মণি চুপি চুপি গেল

কারিগরের কাছে। গিয়ে বলল—ও কেষ্টদা, আমি একটু মেলায় যাব?

কেষ্ট কারিগর তখন ডিমের মামলেট তৈরি করছিল। জিজ্ঞেস করল—মেলায় গিয়ে কি করবি?

—একটা পুতুল কিনব শুধু।

—দেখিস, দেরি করবি না। ছুটে যাবি আর আসবি। মহাজন এসে না দেখলে কিন্তু বকবে।

মণি ছুটে গেল মেলায়। গিয়ে চার পয়সা দিয়ে একটা বড় পুতুল কিনে ফেলল। তারপর ঘুরে বেড়াতে লাগল এদিকে ওদিকে। খুঁজতে লাগল মুক্তাকে আর তার মাকে। যদি ওরা মেলায় এসে থাকে!

কিন্তু খুঁজে পেল না। এত লোকের মাঝে খুঁজে বের করাও মুশকিল। পুতুলের দোকানগুলির কাছে ভাল করে সে দেখতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে দেরি হয়ে গেল অনেক।

এবার দোকানে ফিরল মণি। চুপি চুপি ঢুকে পুতুলটা কোণে একটা টেবিলের তলায় রেখে দিল।

দোকানে তখন খদ্দেরের বেশ ভিড় জমে গেছে। একটা লোক চা দিয়ে পেরে উঠছে না। চেঁচামেচি করছে কোন কোন খদ্দের। এমন সময় পৌঁছে গেল গদাধর।

নালিশ এল নানাদিক থেকে। —কি মশাই, কেমন সব লোক রেখেছেন? চেয়ে চেয়ে চা পাওয়া যায় না।

—আর একজন এলেন মেলা থেকে পুতুল নিয়ে।

—পুতুল নিয়ে? গদাধর ক্ষেপে উঠল। কে পুতুল নিয়ে এল মেলা থেকে?

—দেখুন মশাই টেবিলের নীচে।

গদাধর টেবিলের নীচে তাকিয়েই দেখতে পেল পুতুল। তারপর যে ছেলেটা চায়ের কাপ নিয়ে যাচ্ছিল তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি রে?

গদাধর মণির ঘাড় ধরে মাথাটা ঠুকে দিল দেয়ালে।

ছেলেটি বলল—আমি নই, মণি।

মণি তখন চোরের মতন হয়ে গেছে। গদাধর গিয়ে তার ঘাড় ধরল। তারপর মাথাটা ঠুকে দিল দেয়ালে। মুখ দিয়ে বের হল কদর্য গালি—শূয়ার গাধা। কেন দোকান ফেলে গেছিলি মেলায়? কার কথায় গেছিলি?

মণির মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। মাথাটা টনটন করছে। তার উপর কিল চড় অজস্র এসে পড়ল ওর পিঠে। মণি চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

গদাধর এবার ওকে ছেড়ে ওর পুতুলটাকে নিয়ে পড়ল। টেবিলের তলা থেকে পুতুলটা বের করে আছড়ে ফেলে দিল মাটির উপর। মাটির পুতুল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

মণি বসে বসে কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর ধমক খেয়ে আবার উঠে পড়ল কাজ করতে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। সারা গায়ে ব্যথা। কিন্তু তার মনে সব চেয়ে বেশী লাগছে ভাঙা পুতুলটার জন্য। এত সাধের পুতুল টুকরা টুকরা হয়ে মাটির উপর গড়াচ্ছে।

রাত্তির বেলায় মণি বাড়ি ফিরল। মেলা তখন প্রায় ভেঙে গেছে। দু'একটা খাবারের দোকানের লোক মাত্র রয়েছে তখন। ভাঙা মেলাটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মণির মনে হল যেন তার মনটাও ভেঙে গেছে। একটু আগেও এখানে ছিল কত লোকের ভিড়, কত হাসি খুশী, গান ও বাজনা। মানুষের মনে নিরানন্দ ঢেলে দিয়ে যেন সব চলে গেছে।

মণি চুপি চুপি বাড়ি ঢুকল। বাড়ি নিঝুম। ঘরে তেলের প্রদীপটা টিম টিম করে জ্বলছে। মা ঘুমুচ্ছে। মুক্তা বিছানায় বসে আছে চুপ করে। মণিকে দেখেই মুক্তা লাফিয়ে উঠল—দাদা, পুতুল এনেছিস ?

মণির মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। চোখ দু'টো জলে ভরে উঠল। তবু নিজের মনের ভাব লুকিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল—মেলায় যাসনি ?

মুক্তা কেঁদে কেঁদে বলল—কি করে যাব ? মার যে জ্বর হয়েছে।

মণি গভীর উদ্বেগ নিয়ে মায়ের দিকে তাকাল। নিঃশব্দে নিঃসাড়ভাবে শুয়ে আছে তার মা। মণি কাছে গিয়ে বসল। শব্দ পেয়ে সারদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল—মণি এয়েছিস বাবা ?

মণি চোখের জল চেপে শুধু বলল—হ্যাঁ।

মুক্তা নাকি সুরে কেঁদেই চলেছে। বলছে—আমার পুতুল। আমার পুতুল।

মণি বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। চোখের জলে তার মুখের ভাষা আটকে যাচ্ছে। বুকের ভেতর কি যেন এক গভীর ব্যথা, অথচ বাইরে প্রকাশ করতে পারছে না।

মুক্তার এক পুতুলের জন্য আজ তার জীবনটাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেছে।

পরদিন ভোরবেলায় সূর্য উঠল। কিন্তু মণির মনে হল পৃথিবীটা যেন কেমন হয়ে গেছে। আনন্দ নেই। আশা নেই।

মুক্তা উঠেই আবার কান্না শুরু করল। মেলা শেষ হয়ে গেল, অথচ তাকে পুতুল কিনে দেওয়া হল না।

কি বলে মণি তার কান্না ভোলাবে তা ভেবেই পেল না।

সারদার জ্বর শেষ রাত্রের দিকে ছেড়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলে—কিরে মণি, কাল ছুটি দেয়নি ?

মণি সংক্ষেপে জবাব দিল—না।

—দোকানে খুব ভিড় ছিল বুঝি ?

—হ্যাঁ।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—দাদা, আজ পুতুল পাওয়া যাবে না ?

মণি জবাব দিল—না। মেলা শেষ হয়ে গেছে।

—আবার কবে হবে ?

—আবার এক বছর পরে এমনি দিনে।

—তবে তুই আসবার সময় নিয়ে এলি না কেন ?

—মনে ছিল না। জবাব দিতে গিয়ে মণি যেন আনমনা হয়ে পড়ল।

বেলা বেড়ে যেতে লাগল অথচ মণির দোকানে যাওয়ার নাম নেই। গুম হয়ে বসে রইল। সারদা জিজ্ঞেস করল—কিরে, দোকানে যাবি না ?

কোন জবাব দিল না মণি।

সারদা আবার জিজ্ঞেস করল—শরীর খারাপ লাগছে না তো ?

তবু কোন জবাব নেই।

সারদা তখন গালমন্দ দিয়ে ছেলেকে দোকানের দিকে পাঠিয়ে দিল। মণি অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। শুনতে পেল, মুক্তা তখনও বায়না ধরে কাঁদছে পুতুলের জন্য।

একটা পুতুল কিনে দিতে পারলে বুঝি মুক্তার কাছে সারা পৃথিবীটাই আনন্দের হয়ে উঠত।

দোকানে গিয়েও কাজে মন দিতে পারল না মণি। থেকে থেকে শুধু কালকের কথাটাই মনে হতে লাগল।

সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল মণির। আজ যদি তিনি আসেন তবে তার সঙ্গে চলে যাবে বর্ধমানে, কিছুতেই আর এ দোকানে কাজ করবে না।

গাড়ি এসে পড়ল তবু ভদ্রলোক এলেন না। মণির ভারী খারাপ লাগতে লাগল। গাড়ি ছাড়বারও সময় হয়ে গেল। তবু তাঁর দেখা নেই। নিশ্চয়ই ভদ্রলোক আজ আসেননি। রোজ তো আর তিনি আসেন না।

বর্ধমান শহরে ভদ্রলোক থাকেন। এই গাড়িই তো বর্ধমান হয়ে যাবে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। একটু পরেই গাড়ি ছাড়বে। মণি উঠে পড়ল। চুপি চুপি চলে গেল গাড়ির পেছন দিকে। তারপর ঝুপ করে গাড়িতে চড়ে বসল।

ভদ্রলোকের নাম জানে না মণি। ঠিকানাও জানে না। ভাবল বর্ধমান শহরে গিয়ে খুঁজে বের করে নিতে পারবে। ঘুরতে ঘুরতে নিশ্চয় দেখা হয়ে যাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে।

কিন্তু গাড়ি যখন চলতে শুরু করল তখন কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল মণির। পরিচিত জায়গা ছেড়ে সে চলল কোন্ অচেনা জায়গায়? মার কথা মনে পড়ল। মুক্তার কথা মনে পড়ল। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে লাগল তার।

স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে গাড়ি চলেছে। আর এক স্টেশন পরেই বর্ধমান। মণি চেনে না কিছুই। লোকের মুখ থেকে শুনেই সব বুঝতে পারছে। একবার আনন্দে আর একবার ভয়ে মন তার দুলে উঠছে।

এমন সময় গাড়িতে টিকিট চেকার উঠল। গাড়ির ভেতর ঘুরে ঘুরে সবার টিকিট দেখতে লাগল। মণির মুখ এবার শুকিয়ে উঠল। তার কাছে যে টিকিট নেই। টিকিট কাটার কথা তার মনেই ছিল না। মনে থাকলেও কাটতে পারত না। একটি পয়সাও নেই তার কাছে।

চেকার ঘুরতে ঘুরতে মণির কাছে এল। বলল—টিকিট !

মণি ভয়ে ভয়ে চেকারের মুখের দিকে তাকাল। মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

চেকার জিজ্ঞেস করল—তোমার সঙ্গে কে আছে ?

মণি কাঁপতে লাগল। কোন কথা বলতে পারল না।

এবার জোরে ধমক দিয়ে উঠল টিকিট চেকার। —বল কে আছে তোমার সঙ্গে ?

মণি বলল—কেউ নেই।

—যাচ্ছ কোথায় ?

—বর্ধমান।

—কে আছে তোমার বর্ধমানে ?

—কেউ নেই।

—তবে কার কাছে যাচ্ছ ?

—একজন লোককে খুঁজতে ?

—কে সে লোক ?

—জানি না।

টিকিট চেকার রেগে আগুন হয়ে গেল।

বলল—চালাকি পেয়েছ ? তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেব। একটুখানি ছেলে, তার পেটে এত চালাকি বুদ্ধি ?

মণির এবার দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। আশেপাশের কয়েকজন সহযাত্রীর দয়া হল মণিকে দেখে। তারা বলল—ছেড়ে দিন বাবু, ছোট ছেলে ছেড়ে দিন।

টিকিট চেকার বলল—না মশাই, ছেড়ে দেওয়া যায় না। ছোট ছেলে হলে কি হবে, চোর জোচ্চোর পকেটমার চেনা বড় মুশকিল। গাড়ি থেকে ওকে নামিয়ে দিয়ে তবে যাব।

এর পরের স্টেশনই বর্ধমান। একটু পরেই গাড়ি বর্ধমান ভিড়ল। টিকিট চেকার মণিকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিল।

আবার সেই স্টেশন। এমনি একটি স্টেশনে চায়ের দোকানে কাজ করত মণি। এ স্টেশনটা তার চাইতেও বড়। অনেক আলো, অনেক দোকান এবং অনেক লোকজন এখানে।

মণি এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল। খুঁজতে লাগল সেই ভদ্রলোককে। কিন্তু সেই চেহারার কোন লোককে স্টেশনের কোথাও দেখা গেল না।

একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মণি। দোকানদার জিজ্ঞেস করল—কি চাও ? লজেন্স ?

—না।

—বিস্কুট ?

—না।

—তবে কি চাও ?

—বর্ধমান শহরটা কোন্ দিকে ?

দোকানদার এবার ক্ষুব্ধ হল। বিরক্ত ভাবে বলল—চোখ যেদিকে যায় সোজা সেদিকে চলে যাও।

স্টেশনের গা ঘেঁষেই পথ। মণি সেপথ দিয়ে চলতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে শহরের মতই একটা জায়গায় এসে পড়ল মণি। শহর সে কখনো চোখে দেখেনি। তবে লোকের মুখে শহরের কথা শুনেছে অনেক। সেই রূপকথায় শোনা গল্পের মতই যেন মনে হতে লাগল জায়গাটি। সারি সারি কত দোকান, কত লোকজন ! আলো আর সাজসজ্জার কি সমারোহ। মণির চোখ জুড়িয়ে গেল।

রাত হয়ে গেছে। মণির খেয়াল হল। ভদ্রলোককে খুঁজতে হবে। এতক্ষণ মনেই ছিল না কিছু। পথের দু'পাশে দৃষ্টি রেখে মণি চলতে লাগল। কত পথ ঘুরল। চলতে চলতে পা ব্যথা হয়ে উঠল। ক্ষিদে পেয়ে গেল তার। কিন্তু কোথায় সেই ভদ্রলোক ?

নেই। কোথাও নেই।

কান্না পেল মণির।

চলতে চলতে শহর ছাড়িয়ে এসে পৌঁছল এক নির্জন জায়গায়। এবার ভয় করতে লাগল। ফিরে চলল মণি।

ক্ষিদে পেয়ে গেছে, খাবে কি ? রাত হয়ে গেছে, থাকবে কোথায় ? এসব চিন্তা যে মণি একবারও করেনি।

হাঁটতে হাঁটতে আবার সে স্টেশনে এসে পৌঁছল। শেষ বারের মত আবার খুঁজে দেখল ভদ্রলোককে। নেই। কোথাও নেই। আর চলতে পারছে না মণি। হাত পা অবশ হয়ে আসছে। ক্ষিদেও লেগেছে খুব।

মণি দেখল স্টেশনে অনেক লোক বিছানা পেতে, কেউ বা কাপড় পেতে ঘুমিয়ে আছে। তারও ইচ্ছে হল ঘুমিয়ে পড়বার। কিন্তু কোথায় ঘুমুবে ? কি করে ঘুমুবে ?

অবশেষে একটি ঘুমন্ত লোকের পাশেই জড়-সড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

৫

ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর হয়ে গেছে। পিঠের উপর মণি অনুভব করল লাঠির আঘাত। চোখ মেলে চাইল। কিন্তু চেয়ে আতঙ্কে তার সারা গা শিউরে উঠল। তিন-চারটে পুলিস যমদূতের মত তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক লোকও জমে গেছে চারদিকে।

একটা পুলিস আবার লাঠির গুঁতো মেরে বলল—এই উল্লু—উঠ।

মণি চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসল।

পুলিস বলল—থানামে চল।

মণি কিছু না বুঝে পুলিসের মুখের দিকে চেয়ে রইল। একটা পুলিস বাংলায় জিজ্ঞেস করল—এই ছোকরা, টাকা চুরি করেছিস কেন?

টাকা চুরি? মণি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

পুলিস জিজ্ঞেস করল—তোর বাড়ি কোথায়?

মণি কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল—জুড়ন গাঁ।

—যাবি কোথায়?

আর কোন জবাব নেই।

জোরে ধমক দিয়ে উঠল পুলিসটি—বল, যাবি কোথায়?

অন্য একটি পুলিস হুংকার দিয়ে বলল—থানামে লে চল। ডাণ্ডা লাগানে সে সব কুচ বাহার হো জায়েগা।

মণিকে ধরে রেল-পুলিস নিয়ে চলল থানায়।

তারপরের ঘটনা বড় মর্মান্তিক।

প্রহার—নির্যাতন—হাজত বাস। তারপর চুরির মামলা উঠল কোর্টে। মণি কিছুই জানে না, অথচ তার নামে চুরির অভিযোগ। স্টেশনে কোন এক তীর্থযাত্রী দলের প্রায় দেড়শো টাকার একটি থলি চুরি যায়। নোট, রুপোর টাকা, খুচরো সব মিলিয়ে ছিল একটি থলি পরিপূর্ণ। তারা খবর দেয় পুলিসে। পুলিস খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। ঘুমন্ত মণির বুকের নীচেই নাকি পাওয়া যায় সেই টাকার থলি।

চোর হয়তো চুরি করে টাকা সরাতে পারেনি। ধরা পড়বার ভয়ে ঘুমন্ত মণির বুকের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সেটা শুধু অনুমান। কোন প্রমাণ নেই তার। কাজেই আইনের চোখে মণিই চোর!

বিচারে মণির জেল হল। বয়স অল্প বলে হাকিম একটু বিবেচনা করলেন। এক সপ্তাহের জন্য তাকে চরিত্র সংশোধনের দরুন আটক রাখবার হুকুম হল।

একটি সপ্তাহ। বেশী দিন নয়। দেখতে দেখতে কেটে গেল। কিন্তু মণি বেরিয়ে এল এক নূতন মানুষ হয়ে। সে যেন আর সে মণিই নয়। সে চোর। সে যেন সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। জীবনটাই তার পালটে গেছে। মনটা তার খুঁত-খুঁত করতে লাগল। ঘৃণায় রী-রী করতে লাগল সারা শরীর।

মা আর মুক্তার জন্য মন তার কেমন করতে লাগল। কিন্তু কোন্ মুখে সে ফিরে যাবে বাড়িতে? লোকে শুনলে টিটকারি দেবে। থুথু দেবে তার গায়ে।

মণি উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে শুরু করল। একটি বাড়ির পাশ দিয়ে চলতে চলতে সে থমকে দাঁড়াল। একটি ছেলে পড়ছে—সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

এ যেন তারই পড়ার সুর! সেও তো এই পড়াই পড়েছিল বাড়িতে।

মণি মন স্থির করল। সে বাড়ি যাবে না। ভাল মানুষ হয়ে তারপর বাড়ি যাবে। চোর বলে কেউ যেন তখন তাকে কিছু না বলতে পারে।

হাঁটতে হাঁটতে আবার এক জায়গায় এসে থামল মণি। দেখতে পেল একটি ঘরের বারান্দায় কতগুলি পুতুল। কোনটা রঙীন, কোনটা সাদা, কোনটা বা অর্ধেক রঙ করা হয়েছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল মণি। বারান্দা পেরিয়ে ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটি লোক পুতুলগুলিতে রঙ করছে।

কি সুন্দর পুতুলগুলি। তাদের গাঁয়ের চড়কের মেলার পুতুলগুলির থেকেও সুন্দর।

লোকটির বোধ হয় পেটে কোন ব্যথা আছে। রঙ করতে করতে এক একবার থেমে যাচ্ছে, আর হাত দিয়ে পেটটাকে চেপে ধরছে। লোকটি এবার পেছন ফিরে তাকাল। দেখতে পেল মণিকে। ইশারা করে ডাকল।

মণি কাছে এগিয়ে গেল। লোকটি দু'টি পয়সা মণির হাতে দিয়ে বলল—ঐ ডাক্তারখানা থেকে দু'পয়সার খাবার সোডা এনে দেবে? একটা পুতুল দেব তোমাকে।

মণি পয়সা নিয়ে সোডা আনতে গেল। মন তার ভারী খুশী। একটি পুতুল পাবে। মুক্তা কি খুশী হবে পুতুল দেখে!

সোডা এনে দিতেই লোকটি মণিকে ঘরের কোণের দিকে যেতে ইশারা করল। সেখানে আছে একটি জলের মাটির কলসী আর একটি গ্লাস। মণি সন্তর্পণে জল ভরে এনে দিল লোকটির হাতে।

লোকটি জল মুখে দিয়ে সোডাগুলি গলায় ঢেলে দিল। তারপর অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চাঙা হয়ে উঠল লোকটি। তারপর মণির দিকে তাকিয়ে বলল—বেঁচে থাকো বাবা। কোন্ বাড়ি তোদের?

মণি জবাব দিল—এখানে নয়। জুড়ন গাঁ।

—জুড়ন গাঁ? এখানে কোথায় এসেছ?

—কাজের জন্য এসেছি। আমাকে কাজ দেবেন?

অবাক্ হল লোকটি। বলল—কি কাজ করবে তুমি? তোমার মা, বাবা নেই?

—মা আছে। বাবা নেই।

—আর কে আছে বাড়িতে?

—ছোট বোন আছে।

লোকটির দয়া হল মণির কথা শুনে। বলল —বাবা, সংসারের জ্বালা বড় জ্বালা! সে জ্বালাতেই তো বেরিয়ে এসেছি কৃষ্ণনগর থেকে। গেঁয়ো যোগীর ভিখ মেলে না। বুঝলে। দুটো পয়সা রোজগারের চেষ্টাতেই এসেছি এই বর্ধমানে।

লোকটি একটু থামল। এক পোঁচ রঙ লাগিয়ে দিল একটা পুতুলের গায়ে। তারপর বলল—কিন্তু সব জায়গাই সমান! পয়সা কোথাও নেই। পয়সাগুলো যে কোথায় হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে তাই খুঁজছি। হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে লোকটি বলল—রঙের ভাঁড়গুলো আমাকে একটু এগিয়ে দেবে খোকা? ঐ যে ওখানে আছে।

মণি ভাঁড়গুলো আনতে এগিয়ে গেল।

লোকটা খুশী হয়ে বলল—বেশ কাজের লোক তুমি তো খোকা। কি নাম তোমার?

—মণি।

—তা বেশ নাম। তুমি আমার এখানে কাজ করবে?

—হ্যাঁ।

সেদিন থেকে মণি কাজে বহাল হয়ে গেল। লোকটি বলল—পুতুলগুলির উপর খড়িমাটির রং তো লাগাতে পারবে? তুলি দিয়ে সারা গায়ে সাদা রঙ শুধু মাখিয়ে দেবে। পারবে তো?

মণি বলল—হ্যাঁ।

লোকটি খুশী হয়ে বলল—ব্যাস, তাই করবে। আর ফাইফরমাস একটু খাটবে। চা-টা, পান-টা এনে দেবে। তবে মাইনে কিন্তু আমি দিতে পারব না। দু'বেলা আমার এখানে খাবে আর চার পয়সা করে জল-পানি পাবে।

মণি তাতেই রাজী হল।

মুক্তা ভালবাসে পুতুল। সেই পুতুলের কাজ পেয়ে সে খুশী। এমনই কোন কাজ যেন সে খুঁজছিল।

পুতুলের গায়ে সাদা রঙ মাখানো খুব কষ্ট নয়। মণি সহজেই সে কাজ শিখে গেল। তারপর লাল নীল রঙ মাখাতেও ধীরে ধীরে শিখল। মণি ভাবতে লাগল—এমনি করে পুতুল তৈরি করতেও একদিন শিখে যাবে। মুক্তার মনে তখন আর পুতুলের জন্য কোন দুঃখই থাকবে না। অনেক রকম পুতুল সে তাকে তৈরি করে দেবে।

মাঝে মাঝে মনটা খুবই খারাপ লাগে মণির। মাকে আর মুক্তাকে দেখতে ইচ্ছা হয়। মা কি করছে, মুক্তা কি করছে—সেই কথা ভাবতে ভাবতে অনেক সময় আনমনা হয়ে যায় মণি।

তবু কাজে মণির গাফিলতি নেই। কাজ করছে অবিরত। কাজ শেখবার দিকে ঝোঁকও ওর খুব বেশী। সময় সময় তার আশ্রয়দাতা রাসবিহারীও অবাক্ হয়ে যায়।

এদিকে মণি রাত্রেও বাড়ি ফিরল না দেখে সারদা মুক্তাকে সঙ্গে করে গেল গদাধরের বাড়ি। অন্ধকার রাত। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে বুনো পথ ভেঙে তারা গদাধরের বাড়ি গিয়ে উঠল। গদাধর অবাক্ হয়ে গেল। বলল—সে কি, আমি তো মনে করেছি দুপুরবেলা বাড়ি এসে মণি আর দোকানে যায়নি।

সারদা বলল—দুপুরবেলা বাড়ি আসেনি তো।

গদাধর বলল—তবে গেল কোথায়? আজ দোকানে গিয়ে তো বেশী কাজ করেনি।

দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল সারদার চোখে-

মুখে। বলল—কাল মেলায় যেতে ওকে ছুটি দেননি বলে আজ ও কাজেই আসতে চাইছিল না। অনেক বলে ওকে কাজে পাঠিয়েছি।

গদাধর এবার ভাল মানুষ সাজবার ভান করল। বলল—কাল ও ছুটি চায়নি তো? আর আমি তো ওকে কিচ্ছু বলিনি। আশ্চর্য, ছেলেটা গেল কোথায়?

সারদা কেঁদে উঠল—তাহলে কি হবে?

গদাধর বলল—তোমার ছেলেও বড্ড দুষ্টু হয়েছে মণির মা। কেবল আজেবাজে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। দেখো, কোথায় আবার কার সঙ্গে গিয়ে আড্ডা জমিয়েছে।

সারদা বলল—কিন্তু রাত্রিবেলায় তো মণি কখনো বাইরে থাকে না!

তাহলে আজ রাতটা চুপ করে থাক, কাল ভোরে না হয় খুঁজে দেখা যাবে। চিন্তা করবার কিছু নেই মণির মা। ও ঠিক বাড়ি এসে যাবে।

সারদা মুক্তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু সারা রাত একটুও ঘুমোতে পারল না। দরজা খোলা রেখে লণ্ঠনটা জ্বালিয়েই বসে রইল। নানা দুশ্চিন্তায় ভরে উঠতে লাগল তার মন।

লণ্ঠনটার তেল ফুরিয়ে এসেছিল। জ্বলে জ্বলে কিছুক্ষণ পর সেটা নিভে গেল।

ভোর না হতেই সারদা আবার চলল গদাধরের বাড়ি। গদাধর জিজ্ঞেস করল—মণি বাড়ি ফেরেনি?

সারদা বলল—না।

গদাধর বলল—কি দুষ্টু ছেলে রে বাবা। একরত্তি ছেলে, তার পেটে এত শয়তানী বুদ্ধি? আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও, আমি দোকানে গিয়ে লোকজনদের বলি, ওরা খুঁজে দেখবে।

সারদা নিরুপায় হয়ে বাড়ি ফিরে এল।

কিন্তু খুঁজে কোথাও মণিকে পাওয়া গেল না।

—আমাকে বাঁশী তৈরি করে দিবি? [পৃষ্ঠা ৯২৬

সেদিন নয়, তার পরদিন নয়। দেখতে দেখতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেতে লাগল। তারপর মাসের পর মাস।

সারদা বুক ফাটিয়ে অনবরত কয়েকদিন কাঁদল। তারপর মাঝে মাঝে। তারপর তাও থেমে গেল। বুকের ভিতরই শুধু কান্না জমতে লাগল।

গাছের কচি আম বড় হল। পাকল। আম গাছে গাছে ছড়িয়ে দিল নানা রঙের রঙীন শোভা। দুষ্টু ছেলেমেয়েদের, আর লোভী শেয়ালদের গাছের তলায় আনাগোনা বেড়ে গেল। আম খাওয়াতে আর ছেলেমেয়েদের আনন্দ নেই, আম কুড়ানোতেই যেন তাদের আনন্দ। আর আনন্দ আমের আঁটি দিয়ে ভেঁপু তৈরি করায়।

বাড়ির আনাচে-কানাচে আর মাঠে-ঘাটে তারা খুঁজে বেড়ায় কচি আমের চারা। দুর্গম স্থান

থেকে এমন কি নোংরা জায়গা থেকেও তুলে নিয়ে আসে গাছসুদ্ধু সেই আমের কচি আঁটি। তারপর খোসা ছাড়িয়ে মুখের দিকটা ঘষতে থাকে পাথরের উপর বা গাছের গুঁড়িতে। আর ছড়া কাটতে থাকে—

কালো কালো ভোমরা, কালো ঘাস খায়,
রাত পোহালে ভোমরা খোয়াড়ে যায়।
আমার বাঁশী বাজিস
আর কারুর বাঁশী বাজিস না।

বাদল, কানু, হারু সবাই আসে। মুক্তাকে ডাকে। কিন্তু মুক্তার মনে আর সে আনন্দ নাই। কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছে সে। তবু যায়, খেলা করে। কিন্তু দাদার অভাবটা অনুভব করে সর্বক্ষণ।

একদিন ছোট একটা আমের চারা মুক্তা দেখতে পেল তাদের ঘরের পেছনে। দেখে কি আনন্দ! গাছটা তুলে দৌড়ে গেল কানুদের বাড়ি। কানুকে গিয়ে বলল—আমাকে বাঁশী তৈরি করে দিবি?

কানু খোসা ছাড়িয়ে আঁটিটা ঘষতে লাগল একটা গাছের গুঁড়ির উপর। এমন সময় এল হারু। তার হাতেও একটা কচি আমের আঁটি। কানুর পাশে দাঁড়িয়ে সেও আঁটিটা ঘষতে শুরু করল। কানু আঁটি ঘষতে ঘষতে অমনি ছড়া কাটতে লাগল—

কালো কালো ভোমরা, কালো ঘাস খায়,
রাত পোহালে ভোমরা খোয়াড়ে যায়।
মুক্তার বাঁশী বাজিস
হারুর বাঁশী বাজিস না।

হারুও পালটা ছড়া কাটতে লাগল—

আমার বাঁশী বাজিস
মুক্তার বাঁশী বাজিস না।

কানুর তখন বাঁশী তৈরী হয়ে গেছে। আঁটিটার মুখে কয়েকটা আঙুলের টোকা দিয়ে বাজাতে শুরু করল। ভাল বাজছে না। আবার ঘষতে লাগল। হারুর বাঁশীটাও ভাল বাজছে না।

কানু বলল—কেমন? মুক্তার বাঁশী খারাপ করেছিস, তাই তোর বাঁশীও খারাপ হয়ে গেছে।

হারু বলল—ইস, এই ছাখ, আমার বাঁশী বাজছে।

আবার বাঁশীতে ফুঁ দিল হারু। পোঁ করে একটা শব্দ হয়ে আবার থেমে গেল।

মুক্তার বাঁশী তখন বেজে উঠেছে—পোঁ-ও পোঁ-ও—

হারুর বাঁশীও বেজে উঠল—পোঁ-ও—পোঁ-ও—

সবাই আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল।

মুক্তা বাঁশী বাজাতে বাজাতে বাড়ির দিকে চলল। পথে দেখা হল তার মায়ের সঙ্গে। তার মা কোথায় যেন চলেছে। মুক্তা জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছ মা?

সারদা জবাব দিল—রায়বাবুদের বাড়ি। যাবি?

—হ্যাঁ যাবো।

মুক্তাও চলল তার মায়ের সঙ্গে।

রায় বাবুদের বড় গিন্নী সারদাকে দেখেই ডাকলেন। সারদা কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বড় গিন্নী বললেন—আমিই তোমাকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছিলাম মুক্তার মা।

সারদা জিজ্ঞেস করল—কেন মা ঠাকরুন?

বড় গিন্নী বললেন—কলকাতায় তোমার একটা কাজ ঠিক করেছি। গাঁয়ে থেকে আর কি হবে? না খেয়ে শুকিয়ে মরবে?

সারদা মুখ নীচু করে শুনতে লাগল।

বড় গিন্নী বললেন—আমারই বড় মেয়ে সুরবালার বাড়িতে থাকবে তুমি। কোন কষ্ট হবে না। তুমি আর মুক্তা দুবেলা খাবে, আর মাসে পাঁচ টাকা করে মাইনে পাবে।

সারদা বলল—কলকাতা চলে যাব, কিন্তু মণির কোন খবরই যে পাওয়া গেল না।

বড় গিন্নী বললেন—সে কি আর বেঁচে আছে মুক্তার মা? থাকলে এতদিনে নিশ্চয়ই কোন খবর পাওয়া যেত।

সারদার চোখ ছলছল করে উঠল।

রায় গিন্নী বললেন—সে তোমার শত্তুর ছিল মুক্তার মা। ওর কথা মনে করে আর কোন দুঃখ কর না। আর, কেউ যদি মণিকে ভুলিয়ে নিয়েই গিয়ে থাকে তবে কলকাতায় গিয়ে তার খোঁজ করতে তোমার সুবিধা হবে। আমার বড় মেয়ের জামাই লেখাপড়া জানা লোক, খবরের কাগজে তুলে দেবে।

এবার সারদা রাজী হল।

রায় গিন্নী বললেন—সুরবালার জামাই লোক পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে কালকেই তোমরা চলে যাও। ঘরে তো আর দামী জিনিসপত্র কিছু নেই। শুধু মাটির হাঁড়ি-কলস। এগুলো মাচার উপর তুলে রেখে দাও। তোরঙখানা আর কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিয়ে যাও। কুলুপ লাগিয়ে যেও। আমরা তো আছি, মাঝে মাঝে দেখাশোনা করব।

সারদা বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র গুছাতে শুরু করল। একটি মাত্র টিনের তোরঙ তার সম্বল। তাতেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরতে লাগল।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—মা, কোথায় যাবে?

সারদা জবাব দিল—কলকাতা।

—কেন?

—সেখানে গিয়ে থাকব।

—এখানে থাকবে না?

—না। এখানে আর ভাল লাগে না। কলকাতায় গিয়ে তোমার দাদাকে খুঁজে বের করব।

—আর বাবাকে?

এবার আর কোন জবাব দিল না সারদা। জামা কাপড় গুছাতে গিয়ে মণির আর তার বাবার জামা কাপড়ও হাতে উঠল। কান্নায় ঝাপসা হয়ে গেল তার দু'টি চোখ। কি ভেবে সব জামা কাপড়গুলিই বাক্সে ভরে ফেলল। রেখেই বা যাবে কোথায়?

ভোরবেলায় রায় বাড়ি থেকে লোক এল। কলকাতা থেকে আসা সেই লোক। রায় বাড়ির একজন চাকরও এল সঙ্গে। টিনের তোরঙটা সেই মাথায় নিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। পেছনে চলল সেই লোকটি। তারও পেছনে পেছনে চলল মুক্তা আর সারদা।

এতকালের পরিচিত গ্রাম ছেড়ে যেতে মনে কত কষ্ট হচ্ছে। প্রতিটি পথ, মাঠ আর গাছের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কতকালের পরিচয়। সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে ঐ একটুখানি বাড়ির ভিটা ছেড়ে যেতে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মণি আর তার বাবার স্মৃতিচিহ্ন!

মুক্তার মন খারাপ লাগলেও রেলগাড়িতে উঠে কিন্তু সে সব ভুলে গেল। এই সে প্রথম রেলগাড়িতে চড়ল। বাঁশী বাজিয়ে যখন গাড়ি ছাড়ল, তখন কিনা আনন্দই তার হল! কিন্তু মায়ের দিকে চেয়েই থমকে গেল মুক্তা। দেখল, তার মায়ের চোখে জল। সেই জলভরা চোখ নিয়েই তার মা তাকিয়ে আছে তাদের গাঁয়ের দিকে। ধীরে ধীরে গাঁয়ের গাছপালা বাড়ি ঘর সব দূরে সরে যাচ্ছে।　　(ক্রমশঃ)

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

৬

মণি পুতুলের গায়ে লাল নীল রঙ লাগাতে বেশ শিখেছে। জামা-কাপড় ও গায়ে রাসবিহারীর নির্দেশ মত নানা রকম রঙ সে তুলি দিয়ে লাগাতে পারে। কিন্তু কাপড়ের পাড়, হাতে পায়ের নখ, মুখ ও চোখে রঙ রাসবিহারী নিজেই দেয়। অত চিকন কাজগুলি মণিকে দিতে সে ভরসা পায় না।

তবু মণির চেষ্টা আছে, আগ্রহ আছে। শীগ্‌গিরই সব কাজ সে শিখে ফেলবে।

মণি নিজের হাতে রঙ করা পুতুল নিয়ে বাড়ি ফিরবে। অবাক্ করে দেবে মুক্তাকে। মুক্তা হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবে না পুতুলের গায়ের রঙ তার নিজের হাতের দেওয়া।

দেখতে দেখতে রথযাত্রা ঘনিয়ে এল। একটু দূরে রাস্তাটা পেরিয়ে একটা মাঠ। সেখানে রথের মেলা বসে। রাসবিহারী মণিকে বলল—তোকে কয়েকটা পুতুল দিয়ে আলাদা দোকান দিয়ে দেব। পারবি না পুতুল বেচতে ?

মণি জবাব কি দেবে স্থির করতে না পেরে চুপ করে রইল।

রাসবিহারী বলল—ভয় নেই। বেশী পুতুল একবারে দেব না। গুনে পুতুল নিয়ে যাবি আর বিক্রি হলেই ফের আসবি আমার কাছে। তোর থেকে একটু দূরেই আমি দোকান দেব।

মণি রাজী হল।

মেলার দিন খেয়ে-দেয়ে সকাল সকাল তৈরী হয়ে নিল। রাসবিহারী তাকে জায়গা ঠিক করে দিল মেলার এক কোণে।

বিকালবেলায় জমজমে হয়ে উঠল মেলাটি। মণির সব পুতুল বিক্রি হয়ে গেল। ভারী আনন্দ হল মণির। আবার এল সে পুতুল নিতে রাসবিহারীর কাছে। বিক্রির সব পয়সা রাসবিহারীকে দিয়ে দিল।

আবার দোকান সাজিয়ে বসল মণি। এবারও ধীরে ধীরে পুতুল বিক্রি হতে লাগল। এরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ আনন্দ তার জীবনে নূতন।

কিন্তু সহসা তার আনন্দে বাধা পড়ল। দু'তিনটি ছেলে এল পুতুল কিনতে। তাদের একজন মণির মুখের দিকে চেয়ে বলল—হ্যাঁরে, এ তো সেই ছেলেটা, যাকে পুলিস সেদিন ধরে নিয়ে গেছিল।

আর একটি ছেলে বলল—কবে রে?

—সেই যে স্টেশনে। টাকা চুরি করেছিল।

—ওঃ, সেই চোর ছেলেটা?

মণির চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কান দু'টো দিয়ে যেন বইতে লাগল গরম বাতাস। মণি কোন দিকে তাকাতে পারল না। চোখ বুজে জড়সড় হয়ে বসে রইল।

ছেলেগুলো সরে গেলে মণি পুতুল ক'টা নিয়ে দৌড়ে গেল রাসবিহারীর কাছে। পুতুলগুলো ফেরত দিয়ে বিক্রির পয়সাগুলো ঝনাৎ করে তার সামনে ফেলে দিয়ে বলল—আমি চলে যাব, আজই চলে যাবো বাড়িতে। আর থাকবো না।

রাসবিহারী কিছু না বুঝতে পেরে অবাক্ হয়ে মণির মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে? এই চাবি নে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। তারপর যা করবার করবি।

মণি চাবি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে এল মেলা থেকে। ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল শুধু।

বেশ একটু রাত করেই রাসবিহারী ফিরল। এসে জিজ্ঞেস করল—কিরে মণি, ঘুমুস্‌নি?

মণি জবাব দিল—না।

শরীর খারাপ লাগছে?

—না।

রাসবিহারী মেলা থেকে নিয়ে এসেছে তেলেভাজা, ফুলুরি আর মুড়কি। ডাকল—মণি, উঠে হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে।

মণি বলল—না, খাব না।

—রাত্রিবেলায় না খেয়ে থাকে না। উঠে পড় চটপট।

অগত্যা মণি উঠে কিছু খেয়ে নিল। রাসবিহারী জিজ্ঞেস করল—মন বুঝি খারাপ লাগছে, না রে?

মণি নীরব।

রাসবিহারী বলল—কাল ভোরে চলে যা তোদের বাড়ি। মা বোনের সঙ্গে দেখা করে দু'দিন বাদেই আবার চলে আসবি।

মণি এবারও কোন জবাব দিল না।

রাসবিহারী বলল—তোর জলপানির পয়সা-গুলো তো আমার কাছেই জমা আছে। তার থেকে দুটো টাকা এখন নিয়ে যা। তুই ফিরে এলে হিসেব করবখ'ন।

মণিকে নীরব দেখে রাসবিহারী জিজ্ঞেস করল—কিরে, বাড়ি যাবি তো?

মণি জবাব দিল—হ্যাঁ।

শেষ রাত্রেই মণিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল রাসবিহারী। টিকিট কেটে গাড়ির কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেল। ছোট্ট পুঁটলিতে মণির একটা জামা আর একটা প্যান্ট। রাসবিহারী কিনে দিয়েছিল মণির জলপানির পয়সা থেকে। আর পুঁটলিতে আছে তিন চারটি পুতুল। মুক্তার জন্য মণি নিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ি ছাড়বার সময় রাসবিহারী সতর্ক করে দিল মণিকে—পুঁটলিটা হাতে ধরে রাখবি। ঘুমিয়ে পড়িস না গাড়িতে। টিকিটটা সাবধানে রাখবি।

সেই গাড়ি। যে গাড়ির জন্য মণি আর মুক্তা কতদিন শেষ রাত্রে তাদের গাঁয়ের স্টেশনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে, বাবার প্রতীক্ষায় কতদিন ঘুম থেকে উঠে এসেছে তারা। সেই গাড়িতে চড়েই মণি ফিরছে তাদের গাঁয়ে।

ছোটবাবু মণিকে দেখেই ডাকলেন—কিরে মণি না?

স্টেশনে নেমে তাড়াতাড়ি মণি চলে এল ফটক পেরিয়ে। গদাধরের চায়ের দোকানের লোকেরা যেন তাকে দেখতে না পায়। বাজারটাকে পেছনে ফেলে সোজা পথ ধরে মণি হাঁটতে লাগল।

পরিচিত পথ। পরিচিত দু'পাশের ক্ষেত আর ঝোপ জঙ্গল। তবু তার মনে লাগছে সব কিছু নূতন। মনে তার নূতন আনন্দ।

মুক্তা হয়তো এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। সে মুক্তাকে ডেকে তুলবে। দেবে তাকে রঙীন পুতুল। চড়কের মেলার দিন একটি পুতুলের জন্য মুক্তা কত কেঁদেছিল। আজ তাকে দেবে তিন চারটে পুতুল। চড়কের মেলার পুতুলের চাইতেও সুন্দর আর রঙীন। কত খুশী হবে মুক্তা।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে বাদলদের বাড়ি। পেছনে খড়ের গাদা। কলাগাছের ঝোপ। পাশ দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা কানুদের বাড়ির দিকে। ঐ যে তাল গাছ। ঐ যে পুকুর। কি আনন্দ লাগছে আজ এ সব দেখতে।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে মণি বাড়ির দুয়ারে এসে দাঁড়াল। কিন্তু একি! বাড়িটা এমন দেখাচ্ছে কেন? ঘরের উঠোনটা ভাঙা, মাটি ধ্বসে গেছে। রান্নাঘরের খড়ের চালাটা খুলে মাটিতে পড়ে আছে। নানা আগাছায় ভরে গেছে সারা বাড়ি! মণির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। উঠোনের উপর গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, ঘরে কুলুপ দেওয়া। থপ করে সেখানেই বসে পড়ল মণি। কান্নায় তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল।

কোথায় গেল তার মা আর মুক্তা? কোথায় তারা?

উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। তবু অতি কষ্টে উঠে চলল বাদলদের বাড়ির দিকে। পা যেন চলতে চায় না।

বাদলদের বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বাদল চেঁচিয়ে উঠল—মণি এসেছে! মণি এসেছে!

বাদলদের বাড়ির সকলেই এসে হাজির হল। জিজ্ঞেস করল—কি মণি, এত দিন কোথায় ছিলি?

মণি জবাব দিল—বর্ধমানে।

—তোর মা তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে অস্থির।

—কোথায় গেছে মা?

—কলকাতায়।

—কলকাতায়? কেন?

—এখানে থেকে কি খাবে? কলকাতায় চাকরি করতে গেছে। রায় বাড়ির লোকেরাই তো তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

—মুক্তাও গেছে?

—হ্যাঁ। রায়বাবুর বাড়ি যা। সব খবর পাবি।

—মণি চলল রায়বাবুদের বাড়ি! ছোটবাবু তখন বাগানে ফুলের গাছে জল দিচ্ছেন। মণিকে দেখেই ডাকলেন—কিরে মণি না?

মণি কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কোত্থেকে এলি এতদিন বাদে? আমরা তো ভেবেছিলাম তুই মরে গেছিস?

মণি জিজ্ঞেস করল—মা কোথায় গেছে?

ছোটবাবু বললেন—তোর মায়ের কথা জিজ্ঞেস করিস না মণি। তোর মাকে আমরাই কলকাতা পাঠিয়েছিলাম আমাদের সুরবালার বাড়িতে। কাল চিঠি এসেছে, সে নাকি রাগ করে সে-বাড়ি থেকে চলে গেছে।

মণি অসহায়ের মত জিজ্ঞেস করল—কোথায় গেছে?

ছোটবাবু বললেন—সে নাকি কিছু বলে যায়নি। গরিব লোকের কি এত দেমাক থাকা ভাল?

মণির তখন বুক কাঁপছে। হাত পা অসাড় হয়ে আসছে। তবু আর সে সেখানে দাঁড়াল না। স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

একটু আগে এ পথ দিয়েই সে এসেছিল। তখন মনে ছিল কত আনন্দ আর কত আশা। আবার সে পথ দিয়েই সে ফিরে যাচ্ছে কত দুঃখ নিয়ে।

সামান্য একটা ভুলের জন্য সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। কোথায় চলে গেল তার মা আর মুক্তা! এত সাধের পুতুলগুলো সে মুক্তার হাতে দিতে পারল না।

চলতে চলতে পথের মাঝে হঠাৎ গদাধরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। গদাধর জিজ্ঞেস করল—কিরে মণি, কোত্থেকে এলি?

মণি এড়িয়েই চলে যেতে চেয়েছিল গদাধরকে। গদাধর বলল—এমন করে কেউ না বলে কয়ে চলে যায়? কোথায় ছিলি এতদিন?

মণি মুখ নীচু করে একটু দাঁড়াল। কোন জবাব দিল না।

—তোর মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না।

—তারা তো কলকাতায় গেছে। তুই যাচ্ছিস আবার কোথায়?

—কলকাতায়।

—কলকাতায় গিয়ে কি আর তোর মাকে খুঁজে পাবি? রায়বাবুর মুখ থেকে সব কথা আমি শুনেছি। তার চেয়ে আমার দোকানে আবার কাজে লেগে যা। সুখে থাকবি।

মণি কথার কোন জবাব না দিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। গদাধর শুধু পেছনে তাকিয়ে বলল—ইস, দেমাক দেখ একরত্তি ছেলের!

মণি স্টেশনে গিয়ে গদাধরের চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কেষ্ট কারিগর তখন চা তৈরি করছিল। মণিকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—হ্যাঁরে মণি যে! তুই বেঁচে আছিস? আয়—আয়—আয়।

কেষ্ট টেনে ভিতরে নিয়ে গেল মণিকে।

—কোথায় ছিলি এতদিন ডুব মেরে?

—বর্ধমানে।

—বর্ধমানে? কি করছিলি সেখানে?

মণি পুঁটলি খুলে কেষ্টকে দেখাল নানা রঙের সেই পুতুলগুলি। কেষ্ট জিজ্ঞেস করল—এগুলি পেলি কোথায়?

মণি বলল—সেখানে এক পুতুল তৈরীর কারখানায় কাজ করতাম। আমি নিজের হাতে এই পুতুলের রঙ করেছি।

—অ্যাঁ, বলিস কিরে? এত ওস্তাদ হয়ে গেছিস তুই? এই কাজ ছেড়ে এলি কেন?

—কলকাতায় যাব কেষ্টদা।

—কলকাতায়? ওঃ, তোর মায়ের কাছে? ঠিকানা জানিস?

—না তো।

—তবে কেমন করে খুঁজে বের করবি? কলকাতা কি আর একটুখানি শহর? একি! তোর চোখ মুখ দেখি শুকিয়ে গেছে। কিছু খাসনি বুঝি? নে, চট করে খেয়ে নে। বলে কেষ্ট এক টুকরা পাউরুটি আর এক কাপ চা মণির দিকে এগিয়ে দিল।

মণি খেতে ইতস্ততঃ করছে দেখে বলল—খা, তুই তো আর মালিকেরটা খাচ্ছিস না। ওটা আমার খাবার।

—তুমি খাবে না কেষ্টদা?

—না, তুই খা।

মণি খেতে শুরু করল। কেষ্ট বলতে লাগল—কলকাতায়ই চলে যা মণি। সেখানে গেলে কাজ একটা যোগাড় করে নিতে পারবি। আমিও একদিন চলে যাব। এখানে কাজ করতে একটুও মন চায় না। আমাদের মালিক মানুষ নয় রে—একটা আস্ত পশু। তোকে কি মারটাই সেদিন মারলে!

মণির চোখ ছলছল করে উঠল। পুতুল ভাঙার কথাটা বুঝি মনে পড়ে গেল।

কেষ্ট বলল—তুই চলে গিয়ে ভালই করেছিস। এখানে কাজ করলে মার খেয়ে মরে যেতিস।

মণির খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল।

কেষ্ট বলল—ভাল কথা মনে পড়েছে রে মণি। আমার মামার পুতুলের দোকান আছে কলকাতার কালীঘাটে। পুতুল তৈরীও হয়। সেখানে গেলে তোর একটা চাকরিও হয়ে যেতে পারে।

মণি বলল—কি করে যাব সেখানে?

কেষ্ট বলল—আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছি। তুই হাওড়া স্টেশনে নেমে ট্রামে উঠে ধর্মতলা চলে যাবি। ট্রাম দেখেছিস কখনো?

—না।

—তুই ছেলেমানুষ, কি করে যে যাবি তাই ভাবছি! আজ কি বার? শনিবার? আচ্ছা দাঁড়া, কলকাতায় যাবার চেনা লোক তোকে ধরিয়ে দিচ্ছি। তাহলে তোর সুবিধে হবে।

মণি যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গেল।

গাড়ি ছাড়বার এখনো তো দেরি আছে রে। তুই চান করে নে। আমাদের বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে যাবি।

মণি বলল—না, আর খাব না। একটু পরে মাথা ধুয়ে নেব। চানও করব না।

কেষ্ট বলল—সে কিরে, ভাত না খেয়ে সারাদিন থাকবি! বাড়িতে না খাস এখানেও তো ভোলা রান্না করবে, তা-ই না হয় এক মুঠো খেয়ে নিস।

মণি এবার আপত্তি করল না!

কেষ্ট বলল—আমারও কলকাতা যাবার ইচ্ছা ছিল রে। শুধু বুড়ো মাকে বাড়িতে একা ফেলে যেতে পারছি না। নইলে কবে চলে যেতাম। এখানে এই ছোটলোকের কাছে কি কেউ চাকরি করে? ছ্যা, ছ্যা।

কলকাতা যাওয়ার সঙ্গী সত্যি পাওয়া গেল। এমনকি কালীঘাটে যাওয়ার লোকই পাওয়া গেল। কেষ্টর চেনা লোক। মণিকে তার সঙ্গে দিয়ে কেষ্ট অনেকটা নিশ্চিন্ত হল। (ক্রমশঃ)

---

৯ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১৯টি ত্রিকোণ

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

৭

সারদা মুক্তাকে নিয়ে কোলকাতায় পৌঁছে গেল। প্রথম শহরে পা দিয়ে ভারি খুশী হয়েছিল মুক্তা। এত গাড়ি, এত বড় বড় বাড়ি, এত লোকজন মুক্তা কখনো দেখেনি। কিন্তু যখন শোভাবাজার অঞ্চলের এক বাড়ির ভিতর ঢুকল, তখন যেন কেমন লাগতে লাগল মুক্তার। ফাঁকা মাঠ নেই, পুকুর নেই, গাছপালা নেই, ইঁটের দেয়ালে ঘেরা পাকা বাড়ি। দম আটকে আসে।

প্রথম দিনটা কোন রকমে কেটে গেল। পরের দিন ভোর বেলা উঠেই কাঁদতে লাগল মুক্তা। দুয়ার নেই, মাঠ নেই—কোথায় খেলা করবে? বাদল, হারু, কানু কেউ নেই—কার সঙ্গে খেলা করবে?

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—মা, বাড়ি যাবে না।

সারদা বলল—সে কিরে! কালকে মোটে এলাম, আজকেই চলে যাব?

—কবে যাবে?

—এখানে কিছুদিন থাকব, তারপর যাব।

—না, এখানে ভাল লাগে না।

এমন সময় রায়গিন্নীর মেয়ে সুরবালার ডাক পড়ল। সুরবালা বলল—এই চা আর মুড়ি খেয়ে নাও মুক্তার মা, তারপর তোমার কাজকর্ম সব বুঝে নাও।

সারদা বলল—আমি চা খাই না, দিদিমণি।

সুরবালা বলল—এখানে এলে খেতে হয়। চা ছাড়া ভোরবেলায় জলখাবার আর কি খাবে?

মুক্তা কিন্তু চায়ের বাটি দেখে খুব খুশী। চা মুড়ি খেতে খেতে বাড়ির কথা কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেল।

সারদাকে কি কি কাজ করতে হবে সুরবালা তা বুঝিয়ে দিল। ঘর মুছতে হবে, মসলা বাটতে হবে, থালা-বাসন মাজতে হবে আর কাপড়-জামা কাচতে হবে। রান্না করবার আলাদা লোক আছে।

সুরবালার শাশুড়ী বুড়ী। পূজা আহ্নিক করে। তার ঘরটা সবার আগে গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে মুছে দিতে হয়। নইলে সে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেয়।

সারদা কাজে লেগে গেল। মুক্তারও ধীরে ধীরে সব সয়ে গেল। বাড়ি যাওয়ার জন্য রোজ বায়না ধরে না। মাঝে মাঝে খারাপ লাগলে মায়ের কোলে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকে।

কিন্তু বেশীক্ষণ কোলে বসে থাকতে পারে না। একটু পরেই হয়তো ডাক আসে—এই মুক্তার মা…

সারদা মুক্তাকে কোল থেকে নামিয়ে কাজে চলে যায়। মুক্তাও হরিণ-শিশুর মত মায়ের পিছনে পিছনে ঘুরতে থাকে। কখনো বা খেলা করতে বসে যায় সুরবালার মেয়ে বেবীর সঙ্গে।

বেবী মুক্তার সমবয়সী, কিন্তু বয়সে সমান হলেও অবস্থায় ও মর্যাদায় সমান নয়। বেবী যা খায় মুক্তা তা খেতে পায় না। বেবী যা জামা পোশাক পরে মুক্তার তা জোটে না। বেবী যা আবদার করে মুক্তার তা আবদার করা সাজে না।

কিন্তু অতটা বুঝবার মত মুক্তার বয়স হয়নি। তাই সে বেবীর খাবার দেখে লোভ করে, সাজ-পোশাক দেখে পরতে চায়, হাতে কোন জিনিস দেখলে বায়না ধরে।

এই নিয়ে মাঝে মাঝে অশোভন ঘটনাও ঘটে যায়। বেবীকে ভাত খেতে দেখে মুক্তাও হয়তো কোনদিন বলে—ভাত খাব, খিদে পেয়েছে।

সারদা বলে—একটু পরে খাবি, এখন বাইরে যা মা।

মুক্তা বলে—বেবী যে খাচ্ছে।

সারদা বলে—আমার সঙ্গে একটু পরেই ভাত খাবি।

কিন্তু মুক্তার খিদে হয়তো সত্যি বেশী পেয়ে গেছে। তাই সে নাকা সুরে কান্না জুড়ে দেয়—ভাত খাব, খিদে পেয়েছে।

সুরবালা ধমক দিয়ে ওঠে—এমন করে নাকি সুরে কাঁদবি না, যা এখান থেকে। কি রাক্ষুসে মেয়ে রে বাবা। সারা দিন খালি খাই খাই।

কোনদিন রাত্রিবেলায় হয়তো বেবী খেতে বসেছে। ঘুমিয়ে পড়বে বলে মুক্তাকেও খেতে দেওয়া হয়েছে সেই ঘরের এক কোণে। বেবীকে দুধ দেওয়া হল, অথচ মুক্তাকে দেওয়া হল না। মুক্তা ইনিয়ে বিনিয়ে মাকে বলতে লাগল—মা, আমাকে দুধ।

সারদা বলল—কাল দুধ খাস, মা।

মুক্তা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—আমাকে তো কোনদিন দুধ দেয় না মা।

সারদার কান্না পায়। জবাব দিতে গিয়ে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। ভাবে, গরিব হয়ে জন্মানো কত পাপ।

সারদা মেয়েকে চুপি চুপি বলে—ওদের দুধ ওরা খাবে মা। তোমাকে একদিন দুধ কিনে দেব।

নীচের তলায় একটি অন্ধকার কুঠরিতে সারদা মুক্তাকে নিয়ে শোয়। মুক্তা জিজ্ঞেস করে—মা, ওদের ঘরে কি সুন্দর বাতি। টিপলেই জ্বলে ওঠে। এ ঘরে নেই কেন?

সারদা বলে—ওরা বড়লোক, তাই ওদের ঘরে এত আলো।

মুক্তা জিজ্ঞেস করল—আমরা কবে বড়লোক হব, মা?

সারদা বলে—হবে মা। ভাগ্যে থাকলে সব হবে।

মুক্তা সে কথার অর্থ বোঝে না। তাই সে চুপ করে থাকে। তারপর দাদার কথা জিজ্ঞেস করে। বাবার কথা জিজ্ঞেস করে। নানা গল্প

শুনতে শুনতে মায়ের বুকে মুখটি রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

অপ্রশস্ত বদ্ধ জায়গায় থাকতে সারদাও অভ্যস্ত নয়। তারও সময় সময় মনটা কেমন করে ওঠে। ছোট কলঘরে বাসন মাজতে মাজতে মনটা হাঁপিয়ে ওঠে।

সুরবালার শাশুড়ী বড় খিটখিটে মানুষ। সারদা ঘুম থেকে উঠে সব কিছু কাজ করবার আগেই গঙ্গাজল নিয়ে সেই ঘরটা ধুয়ে মুছে দিতে হয়। মুক্তা তখন প্রায়ই ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন দিন ঘুম থেকে উঠে মায়ের পিছু পিছু চলে যায়।

সেদিনই হয় মুশকিল। বুড়ী হইহই করে ওঠে —অ্যাই, সর সর, বাইরে যা! চৌকাঠ মাড়াস নে। এই ছ্যাখো, সকালবেলাতেই কি অলুক্ষুণে কাণ্ড!

মুক্তা ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে যায়।

বুড়ী আবার চেঁচিয়ে ওঠে—অ্যাই অ্যাই আবার ধুলো পায়েই ধোয়া জায়গাটা মাড়ালি? ও মুক্তার মা, তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছ? মুক্তাকে এখান থেকে সরাও না!

সারদাও ধমক দেয় মুক্তাকে—অ্যাই মুক্তা, বাইরে যা।

মুক্তা চোরের মত চুপি চুপি বাইরে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে মুক্তা বুঝতে পারল, এ বাড়িতে তার যেখানে ইচ্ছা ছুটে বেড়াবার স্বাধীনতা নেই। অন্য লোকে যা খায় তা খাবারও তার অধিকার নেই। তাকে যেন সবাই ঘৃণা করে। এক মা ছাড়া আর কেউ তাকে ভালবাসে না।

বুধুর মা বলে একজন মেয়েমানুষ মাঝে মাঝেই আসে এই বাড়িতে। বয়স অনেক হয়েছে।

বুড়ী হইহই করে ওঠে—অ্যাই, সর সর, বাইরে যা!

তবে এখনো খুব বুড়ী হয়নি। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। বিধবা। এ বাড়ির রাঁধুনির সঙ্গে ওর খুব ভাব। এসে গল্প-গুজব করে, রান্না-ঘরের কোণে বসে কত হাসি-মস্করা, কত গল্প—যেন শেষ হতে চায় না।

সারদার সঙ্গেও মাঝে মাঝে গল্প করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কথা জিজ্ঞেস করে সারদাকে। পেটের কথা সব বের করে নিতে চায়।

বুধুর মা মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশও করে সারদার জন্য। বলে—ইস, তোমাদের কি কপাল মন্দ গো। স্বামী মরল, আবার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছেলেটাও দেশান্তরী হয়ে গেল।

সারদা বলে—এ বাড়ির জামাইবাবুকে তো বলেছি মণির খোঁজ করবার জন্য। খবরের কাগজে নাকি ছাপিয়ে দিলে খোঁজ পাওয়া যায়?

বুধুর মা অবাক্ হয়ে গালে হাত দিয়ে বলে—সে কেমন করে হবে গো? খবরের কাগজের লোকেরা তোমার ছেলেকে চিনবে কেমন করে?

সারদা বলে—জামাইবাবুও তাই বলেছেন। খবরের কাগজে দিলেও নাকি ছেলেকে পাওয়া যাবে না। আমার দশা কি হবে দিদি?

বলতে বলতে সারদার চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ বাড়িতে থাকা ধীরে ধীরে দুঃসহ হয়ে উঠল। সারদা গরিব। মনও তার গরিবের মত। কিন্তু বড়লোক হয়েও এ বাড়ির লোকগুলির মন যেন ছোট। সুরবালার স্বামী লোক মন্দ নয়। কিন্তু সুরবালা যেন কি রকম। আর বুড়ী শাশুড়ী তারও এককাঠি উপরে। সুরবালাকে সহ্য করা গেলেও তার শাশুড়ীকে সহ্য করা যায় না।

বেবী একটা পুতুল এনেছে। জামা-কাপড় পরানো বেশ সুন্দর বড় পুতুল। মুক্তার ভারী লোভ লাগল। সে মাকে গিয়ে বলল—মা, আমাকে একটা পুতুল এনে দাও।

সারদা বলল—পরে এনে দেব। এখন ঐ পুতুলটা দিয়েই বেবীর সঙ্গে খেলা কর।

মুক্তা গেল বেবীর সঙ্গে ভাব জমাতে। কিন্তু ঐ পুতুল পেয়ে বেবীর অহংকার যেন বেড়ে গেছে। মুক্তার কাছে ঘেঁষতেই চাইল না। পুতুলটা দেখিয়ে মুক্তাকে বলতে লাগল—দেখেছিস, আমার কি সুন্দর পুতুল! এত সুন্দর পুতুল তোর আছে?

মুক্তা বলল—আমাকে মা এনে দেবে।

বেবী বলল—ইস, মিছে কথা। তোর মা পয়সা পাবে কোথায়?

মুক্তা বলল—আমার মার কাছে পয়সা আছে।

বেবী বলল—তবে তোর মা আমাদের বাড়ি চাকরি করে কেন?

মুক্তার মনে এ প্রশ্ন কোনদিন জাগেনি। আজ বেবীর কথায় তার মনে হল। সত্যি হয়তো তার মায়ের কাছে পয়সা নেই। নইলে তাকে পুতুল কিনে দেয় না কেন?

মুক্তা বেবীর আরও কাছে গিয়ে বলল। বলল—আমাকে তোর সঙ্গে খেলতে দিবি?

বেবী বলল—না, ঠাকুমা তোর সঙ্গে খেলতে মানা করেছে। তোর সঙ্গে মিশলে আমি খারাপ হয়ে যাব।

মুক্তা অভিমান করে চলে যায় মায়ের কাছে। কেঁদে মার কোলে লুটিয়ে পড়ে। বলে—বেবী আমাকে খেলতে দিচ্ছে না।

সারদা বলে—আমি তোমাকে পুতুল এনে দেব। তুমি খেলা করবে।

মুক্তা তবু কাঁদতে থাকে।

সারদা প্রবোধ দিয়ে বলে—দাদা এসে কত পুতুল দেবে তোমাকে। বেবীর চেয়েও ভাল সুন্দর পুতুল।

কাঁদতে কাঁদতে মুক্তা ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুম থেকে উঠে মুক্তার মনে পড়ে যায় বেবীর পুতুলের কথা। মা তখন বাসন মাজতে কলঘরে চলে গেছে। চুপি চুপি মুক্তা চলে যায় উপরে। বেবী যেখানে বসে খেলা করছিল সেই জায়গায় গিয়ে দেখে বেবী নেই। কিন্তু পুতুলটি সেখানে পড়ে আছে। (ক্রমশঃ)

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

৮

মুক্তা চারদিকে চেয়ে দেখল। কেউ কোথাও নেই। তাড়াতাড়ি পুতুলটা তুলে নিয়ে সে ছুটে আসতে লাগল।

কিন্তু বুড়ী যে ওৎ পেতে সব দেখছিল মুক্তা তা টের পায়নি। সে ঘরের কাছ দিয়ে আসতেই বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল—ওরে, ধর ধর, কে আছিস ধর।

একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগল—ওরে, তোরা কি সব যমের দুয়ারে গেছিস? ধর ধর। পালাচ্ছে।

শাশুড়ীর গলা শুনে সুরবালা ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে মা?

—ছাখ ছাখ! বলেই মুক্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।—ধর শীগ্‌গির ছাখ কি নিয়ে পালাচ্ছে।

সুরবালা মুক্তাকে ধরে ফেলল। দেখল মুক্তা বেবীর পুতুলটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে। লুকিয়ে রেখেছে বুকের কাছে।

মুক্তা ধরা পড়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সুরবালা পুতুলটাকে কেড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—কিরে, পুতুল নিচ্ছিস কেন?

বুড়ী গলা আরও চড়িয়ে বলল—নিচ্ছে মানে? চুরি করছে। ডাকাতি করছে। ধর ঐ ডাকাত মেয়েটাকে। ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দে।

শোরগোল শুনে সারদা উপরে উঠে এল। দেখল মুক্তা কাঁদছে।

সারদাকে দেখে বুড়ী বলে উঠল—আমি আগেই বলেছি, ও মেয়েটার স্বভাব ভাল নয়। শীগগির এ আপদ বাড়ি থেকে বিদায় করে দে।

সুরবালা বলল—তুমি চুপ কর মা।

বুড়ী আরও জোরে চেঁচাতে লাগল—চুপ করব কেন লো বৌ? চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব সবাইকে জানিয়ে দেব। কোথাকার ঘাটের মড়া কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে! আজই সব বিদায় কর বাড়ি থেকে।

সারদা মুক্তাকে জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে দিদিমণি?

সুরবালা বলল—কি হবে আবার। দেখ, তোমার গুণধরী মেয়ের কাণ্ড! বেবীর পুতুল নিয়ে পালাচ্ছিল।

সারদা মুক্তাকে জিজ্ঞেস করল—কিরে, পুতুল নিচ্ছিলি কেন?

মুক্তা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু খুড়ীর গালিগালাজ তখনো চলেছে।

সারদার রাগ আর অভিমান সবই মুক্তার উপর গিয়ে পড়ল। মুক্তাকে ধরে অজস্র কিল, চড় মারতে লাগল। জোরে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল মুক্তা। তারপর ওকে কোলে তুলে নিয়ে নীচে চলে গেল।

খুড়ী বলল—ইস, আবার মেরে রাগ দেখানো হচ্ছে। ওসব ন্যাকামী আমাদের বুঝতে বাকী নেই! এখন ভালয় ভালয় সরে পড়।

সারদা নীচে নামতে নামতে জবাব দিল—তাই যাব মা, তাই যাব।

মুক্তার জন্যই সারদার মুশকিল হল বেশী। নিজের উপর অবহেলা ও অপমান সহ্য হয়, তবু মেয়ের উপর অবহেলা ও অপমান সারদা সহ্য করতে পারে না।

সেইদিনই বুধুর মা এল। চুপি চুপি বলল—মুক্তার মা, তুমি এ বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারবে না। ওরা কেউ লোক ভাল নয়।

সারদা বলল—কিন্তু কোথায় যাব দিদি? কলকাতায় পথ-ঘাট যে কিছু চিনি না।

বুধুর মা বলল—সেজন্য কিছু ভেব না মুক্তার মা। তোমার কাজ আমি ঠিক করে দেবো। ভবানীপুরের এক বাবু ক'দিন থেকে আমাকে লোকের কথা বলছে। আমি কালই তার সঙ্গে কথা পাকা করে তোমাকে নিয়ে যাব। কিন্তু খুব সাবধান, এ বাড়ির কেউ যেন কিছু জানতে না পায়।

—কিন্তু যাবার সময় যে দেখতে পাবে!

—বলবে, লোকের সঙ্গে দেশে চলে যাচ্ছি।

সারদা মুক্তির পথ পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল—আচ্ছা, তাই হবে দিদি। এখানে থাকতে আর মন চায় না।

পরদিন বুধুর মার পরামর্শে সারদা তার জিনিসপত্র নিয়ে সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। উঠল গিয়ে ভবানীপুরের এক বাড়িতে। এ বাড়ি আগের বাড়ির মত নয়। আরো ছোট, আরো পুরনো। তবু সারদার ভাল লাগল। কিন্তু মুক্তার মন গেল ভয়ানক দমে। কি বিদকুটে জায়গা! তাদের গাঁয়ের বাড়ির মত বাড়ি এখানে নেই কেন? মুক্তার মনে সেই প্রশ্নটাই বারবার জাগতে লাগল।

মণি বর্ধমান শহর দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। এবার কলকাতা দেখে ওর চোখে ধাঁধা লেগে গেল। পথে এত লোকজন ও একসঙ্গে কখনো চোখে দেখে নি। চড়কের মেলা আর রথের মেলা কি এখানে সব দিনই লেগে থাকে? নানা রকমের এত গাড়ি, এত বড় বড় বাড়ি—এ যেন এক স্বপ্নের রাজ্য! মণি যেন নূতন জন্ম নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে।

মণি যার সঙ্গে এসেছিল সেই তাকে কালীঘাটে পুতুলের দোকানে পৌঁছে দিয়ে গেল। রকমারি পুতুলে দোকান সাজানো। শুধু পুতুল নয়, নানা ধরনের খেলনা, পাথরের থালা, বাটি, মেয়েদের শাঁখা, লোহার বালা ইত্যাদি হরেক রকম জিনিস দিয়ে দোকান ভরতি।

নূতন জায়গা। অপরিচিত লোকজন। মণির প্রথম প্রথম যেন কেমন লাগতে লাগল।

দোকানী তার দিকে চেয়ে বলল—কি হে, কাজ করবে তো? না ক'দিন পরে পালিয়ে যাবে?

মণি অবাক্ হয়ে দোকানীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলে কি লোকটি ? কাজে লাগতে না লাগতেই পালিয়ে যাবার কথা জিজ্ঞেস করছে কেন ?

দোকানী বলল—কলকাতার গঙ্গার জল পেটে পড়লেই ছেলেরা চালাক হয়ে যায়। পাখা মেলে উড়তে থাকে। এই দোকানদারী করে কত ছেলেই দেখলাম। ঘেন্না ধরে গেছে !

কিছুক্ষণ পরে পুতুলের কারখানাও দেখতে পেল মণি। সে জায়গাটা কিন্তু অত জম-জমা নয়। সরু গলি পেরিয়ে বস্তির একটা পল্লী। অনেকটা গাঁয়ের মতই যেন। সেখানেই দোকানীর পুতুলের কারখানা। উঠোনে, ঘরে নানা জায়গায় নানা পুতুল ছড়ানো। তার মধ্যে কালীর মূর্তিই বেশী।

মন্দিরে গিয়ে মণি একদিন মা কালীর বিগ্রহও দেখে এল। কারখানার পুতুলগুলি অনেকটা সেই কালীর মতই দেখতে। কালীর মূর্তিই কারখানায় তৈরি হয় বেশী, বিক্রিও হয় বেশী। সব পুতুল কিন্তু এখানে তৈরী হয় না। কৃষ্ণ-নগর থেকে ছাঁচে ঢালাই করা পুতুল আসে। এখানে রং করা হয়, আর রংয়ের উপর ঘামতেল মাখানো হয়। সে পুতুলগুলো দেখতে ভাল। দামও একটু বেশী।

কারখানার কারিগর জগমোহন কিন্তু মণিকে প্রথম আমলই দিল না। বলল—পুচকে ছোঁড়া, ও কি কাজ করবে পুতুলের ? তার চেয়ে বরং পুতুলের মোট বয়ে নিয়ে দোকানে পৌঁছে দিক।

মণি সাহস করে কিছু বলতে পারল না। কিছুদিন মোটই বইতে হল তাকে।

একদিন দুপুরবেলা জগমোহন ছিল না পুতুলের কারখানায়। বিয়ে বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল। বসে বসে সময় কাটছিল না মণির। পুতুলগুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখছিল।
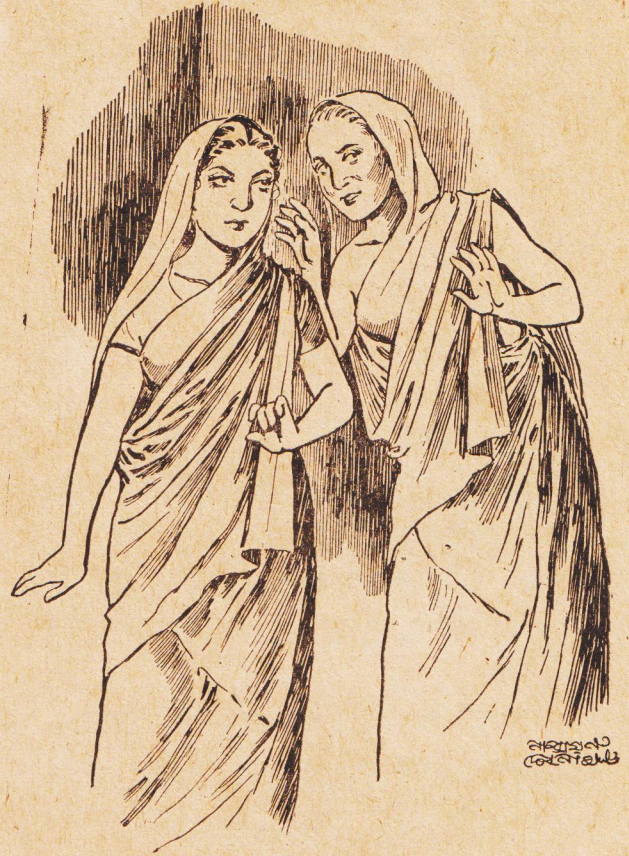
—তুমি এ বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারবে না　　[পৃষ্ঠা ১৭৪

একটি ভাঙা বাতিল করা পুতুল পড়েছিল অন্যান্য পুতুলগুলির এক পাশে। সেই পুতুলটা তুলে নিয়ে মণি রং করতে লাগল। জগমোহন সেই সব পুতুলের যে রং করেছে, ঠিক সেই রংই করতে লাগল মণি।

নিখুঁত রং। কেউ ধরতে পারবে না। ছোট ছেলে এই পুতুলের রং করেছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

মণিরও যেন বিশ্বাস হল না। সেই পুতুল-গুলির মাঝে এই পুতুলটা বসিয়ে দেখতে লাগল সে। কি চমৎকার ! কি সুন্দর ! এত ভাল রং করতে শিখে গেছে বলে নিজেরও ধারণা ছিল না।

সে তন্ময় হয়েই দেখছিল।

হঠাৎ জগমোহন এসে হাজির হল। মণি

সাহস করে কিছু বলতে পারল না। রং খরচ হয়েছে বলে যদি জগমোহন বকে দেয়? তাই চুপ করে রইল। ভাঙা পুতুলটাও সরাতে সাহস পেল না মণি।

জগমোহন এসেই তাড়াহুড়া শুরু করল। একটা ঝুড়ির ভেতর কয়েকটা পুতুল ভরে দিয়ে মণির মাথায় তুলে দিল। বলল—যা, শীগ্‌গির দোকানে পৌঁছে দে। আমি তোর পেছন পেছন আসছি।

মণি পুতুলের ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে চলতে শুরু করল! কিন্তু ভয়ানক অস্বস্তি লাগতে লাগল তার! সেই ভাঙা পুতুলটাও যে এর সঙ্গে চলে এসেছে। কি করবে সে? কোথায় লুকোবে এই পুতুলটাকে। জগমোহন দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই।

মণি ঝুড়ি নিয়ে চলে এল দোকানে। দোকানদার একটি একটি করে দেখে পুতুলগুলি তুলতে লাগ। হঠাৎ সেই ভাঙা পুতুলটা হাতে পড়ল। দোকানদার ক্ষেপে উঠল। বলল—এই ভাঙা পুতুলটা এনেছিস কেন?

এমন সময় জগমোহন এসে পৌঁছল। সে বলল—ভাঙা পুতুল? না, ভাঙা পুতুল কি করে আসবে? তাহলে নিশ্চয়ই মণি রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল।

দোকানদার ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল—সর্বনাশ, তাহলে তো অনেক পুতুলই ভেঙে গেছে। দেখি দেখি। বলে অন্য পুতুলগুলি ভাল করে দেখতে লাগল।

জগমোহন ধমকাতে লাগল মণিকে! গাধা, শুয়োর, এই হালকা বোঝাটা বয়ে আনতে পারলি না? রাস্তায় ফেলে দিলি?

মণির এবার মুখ ফুটল। বলল—রাস্তায় তো ফেলে দেইনি।

জগমোহন মুখ ভেঙচিয়ে বলে উঠল—ফেলে দেই নি! তবে কি হাওয়া লেগে ভেঙে গেল?

মণি ভয়ে ভয়ে বলল—ওটা তো ভাঙাই ছিল।

আবার ধমক দিয়ে উঠল জগমোহন—ভাঙা ছিল মানে? আমি কি কানা, যে ভাঙা পুতুল রং করব?

—ওটা আমি রঙ করেছি।

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল। জগমোহন থমকে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সর্বনাশ, এত ডাহা মিথ্যা কথাও ছেলেটা বলতে পারে?

বিদ্রূপ করে বলে উঠল জগমোহন—দোষ ঢাকার বুঝি আর কোন পথ পেলি নে?

মণি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল অপরাধীর মত। বলল—ভাঙা পুতুলটাই আমি দুপুরবেলা রং করেছি।

জগমোহন হাতে নিয়ে ভাল করে দেখল পুতুলটাকে। সত্যি, এটা যে তার বাতিল করা পুতুল। কিন্তু এত সুন্দর করে রং কে দিল পুতুলটার গায়ে? সে নিজে দেয়নি নির্ঘাৎ। তবে? তবে কি মণিই দিয়েছে রং? এ যে কল্পনাও করা যায় না! সে অবাক্ বিস্ময়ে মণির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দোকানদার এতক্ষণ গম্ভীরভাবে সব লক্ষ্য করছিল। এবার বলে উঠল—জগমোহন, ওকে দিয়ে মোট না বইয়ে তোমার কাজের ভারই কাল থেকে ওকে দিও।

জগমোহন মুখ নীচু করল।

এর পর থেকে পুতুল রং করার ভার মণি পেল। জগমোহন স্বেচ্ছায় এ কাজের ভার মণিকে দিল না, দিল দোকানদারের নির্দেশে।

কিন্তু মণিকে ভাল চোখে দেখতে পারল না জগমোহন। নিজের স্বার্থহানির চিন্তায়

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। গোপনে গোপনে মণিকে সরাবার চেষ্টা করতে লাগল।

কলকাতায় এসে অবধি সারদা মনে আশা করেছিল, মণিকে ফিরে পাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে আশা নিভে যেতে লাগল। দুঃখের বোঝা যেন ভারী হয়ে উঠতে লাগল তার।

চোখের জলের সময় অসময় নেই। অবসর সময়ে এমন কি কাজকর্মের মাঝখানেও হুহু করে চোখের জল এসে পড়ে সারদার। চিৎকার করে কিছুদিন কাঁদতে পারলে বুঝি তার বুক অনেকটা হালকা হয়ে যেত। কিন্তু সে উপায় নেই। কান্নায় বুক ভারী হয়ে ওঠে, অশ্রুতে দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সত্যি একদিন চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল সারদা। চোখের জল আঁচলে মুছে ভাল করে চেয়ে দেখতে চেষ্টা করল। না, ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে!

মনে মনে প্রমাদ গনল সারদা। চোখের মত এমন অমূল্য রত্ন হারালে যে পৃথিবীই অন্ধকার হয়ে যাবে তার কাছে! সব কিছু আশা ভরসা চলে যাবে।

মুক্তার এখন একটু একটু বুদ্ধি হয়েছে। বায়না এখন কম ধরে। টুকিটাকি কাজও করে মায়ের সঙ্গে।

দিন তারিখের হিসাব মুক্তা জানে না! কিন্তু বুঝতে পারে, অনেকদিন হল তারা কলকাতা এসেছে। অনেকদিন। বাড়ির কথা আবছা-আবছা মনে পড়ে। মন থেকে যেন অনেক দূর চলে গেছে গাঁয়ের সেই পথ—মাঠ-পুকুর। বাদল, কানু, হারু ওরা যেন কেমন অচেনা অচেনা হয়ে গেছে।

কলকাতার দেয়াল-ঘেঁষা এই বাড়ি। এই সংকীর্ণ উঠান এখন আর অত খারাপ লাগে না। অনেকটা গা সহা হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ির লোকগুলিকে ভারী খারাপ লাগে মুক্তার। বিশেষ করে ঐ মোটা কালো লোকটাকে। ঐ নাকি বাড়ির কর্তা! দালালির কাজ করে। দালালি কি জিনিস মুক্তা বোঝে না। তবে কাজটা বোধহয় খুব খারাপ। নইলে লোকটা এত গম্ভীরভাবে থাকে কেন! হাসে না, কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না। লোককে মিছে-মিছি ধমক দেয়।

মুক্তার মাকেও মাঝে মাঝে ধমক দেয় সেই লোকটা। মুক্তার মা আগের মত কাজ করতে পারে না। এই তার অপরাধ। মুক্তার ভারী খারাপ লাগে তখন। ধমক খেয়ে তার মা মুখ ভারী করে থাকে। কখনো কখনো চোখের জল ফেলে। তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে মুক্তা!

সে এগিয়ে যায় মাকে কাজে সাহায্য করতে। সারদা বাধা দিয়ে বলে—থাক, আমিই করছি।

অবসর সময়ে সারদা মুক্তাকে কোলে টেনে নেয়। আদর করে বলে—তুই আমার ছোট্ট মা। কবে তুই বড় হবি, আমার দুঃখ ঘুচবে।

মুক্তা বলে—এই তো আমি বড় হয়েছি মা।

সরদা বলে—আরও বড় হবি, তখন আর আমাকে কাজ করতে হবে না।

মুক্তা বলে—কার মত বড়? তোমার মত?

দুঃখের মাঝেও সারদার মুখে হাসি আসে। বলে—হ্যাঁ।

তবে এই বাড়ির একটি লোককে শুধু ভাল লাগে মুক্তার। শান্তি পিসীকে। বাড়ির কর্তার বিধবা বোন শান্তিলতা। বয়স খুব বেশী নয়। ছেলেমেয়েরা তাকে শান্তিপিসী বলে ডাকে। মেয়েটির মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। বেশী জোরে কথা বলে

না, কারুর সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি করে না। মুক্তাকে সময় সময় আদর করে কাছে ডাকে। এটা ওটা খেতে দেয়। বাড়ির মধ্যে এই শান্তিপিসীই যেন আলাদা ধরনের।

মুক্তা ধীরে ধীরে বুঝতে পারল, সে যতই কাজ করতে শিখছে, তার মা ততই অক্ষম হয়ে পড়ছে। বেশীক্ষণ কাজ করতে পারে না। হাঁপিয়ে ওঠে। চোখেও ভাল দেখতে পারে না।

এদিকে সারদা যতই কাজ কম করছে, বাড়ির কর্তা সেই মোটা লোকটার মেজাজ ততই কড়া হয়ে উঠছে।

কিছুদিন পর সারদার চোখের দৃষ্টি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। মোটা লোকটা তখন মাঝে-মাঝেই গালমন্দ করতে লাগল। বলতে লাগল—একি আপদ ঘাড়ে চাপল? ওকে কে দেখাশোনা করবে? নিজের জ্বালায় বাঁচি না, আবার পরের ঝামেলা!

বাড়ির মেয়েরা বলতে লাগল—ওকে হাস-পাতালে পাঠিয়ে দাও। চোখ কাটালেই ভাল হয়ে যাবে।

মোটা লোকটির মেজাজ আরও তিরিক্ষি হয়ে উঠল। বলল—হুঁ! নিজের কাজ ফেলে ওসব ঝামেলা কে করবে! ওকে বরং বল অন্য কোথায় চলে যাক?

কিন্তু কোথায় যাবে? ইচ্ছা করলেই কি যাওয়া যায়?

কিন্তু এটা তার নিজের বাড়ি নয়, এখানে জোর করে থাকবেই বা কি ভাবে। কি জোর খাটবে এখানে?

দিন দিন লাঞ্ছনা-গঞ্জনারও শেষ নেই। এর চেয়ে মরণও ভাল। মরণে তার কোন দুঃখ নেই। ভাবনা শুধু মুক্তার জন্য। সে মরে গেলে মুক্তার কি দশা হবে? হয়তো বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়াবে। তারপর না খেতে পেয়ে হয়তো মরে পড়ে থাকবে পথের ধারে।

এই আশঙ্কাতেই তো মরবার কথা এখন কল্পনা করতে পারে না সারদা!

একদিন শান্তিলতা বলল—মুক্তার মা, তুমি কোথাও গিয়ে নিজের পেট চালাবার ব্যবস্থা কর। এখানে থাকলে শুধু জ্বালাতনই হবে।

সারদা বলল—চোখে দেখতে পাই না, আমি না হয় ভিক্ষা করেই কোন রকমে দিন চালাব দিদি। কিন্তু মেয়েটার কি হবে? ওকে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করতে যে প্রাণে সইবে না।

শান্তি বলল—ও না হয় আমার কাছেই থাক। আমি যা খাই তার থেকে দুমুঠো ওকেও দেব।

সারদা যেন অকূলে একটু কূলের রেখা দেখতে পেল। বলল—গঙ্গার ঘাটের কাছে অনেক অতিথিশালা আছে, সেখানে আমাকে পৌঁছে দেবে দিদি?

—সেখানে গিয়ে কি করবে?

—ভিক্ষা করব আর রাত্রিবেলায় শুয়ে থাকব।

—আচ্ছা, তাই যেও! কাল আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব!

পরের দিন সকালেই নিজের সামান্য জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিল সারদা। কি আর জিনিস! ছোট্ট একটা পুঁটলিতেই সব কুলিয়ে গেল। মুক্তার কিছুই সঙ্গে করে নিল না, শান্তিলতার কাছেই রেখে গেল।

গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার সময় মুক্তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সে থাকবে কার কাছে?

যেতে যেতে মুক্তা জিজ্ঞেস করল—মা, আজ গঙ্গা চান করতে যাচ্ছ কেন?

সারদা বলল—গঙ্গায় চান করলে পুণ্যি হয়।

মুক্তা বলল—তবে যে এতদিন চান করনি!

সারদা স্তব্ধ হয়ে গেল। সত্যি, এ কথার কি

জবাব দেবে ? বড় বড় স্নানের যোগ গেছে, তবু সে যেতে পারেনি। ছুটি পায়নি কিছুক্ষণের জন্যও। এমনি কাজের বেড়াজালে সে বন্দী ছিল।

সারদা কোন কথা বলল না। শান্তিলতার হাত ধরে চলতে লাগল। চোখের দৃষ্টি নেই, অপরের সাহায্য ছাড়া সে চলতে পারে না।

গঙ্গার ঘাটে এসে শান্তিলতাই হাত ধরে সারদাকে স্নান করাল। ভিজে কাপড়টা ছাড়িয়ে একটা শুকনো কাপড় পরিয়ে দিল। কাছেই একটা রেলিংএর সঙ্গে কাপড়টা বেঁধে দিয়ে শান্তি বলল—কাপড়ের এই আঁচলটা এক হাতে ধরে রাখো মুক্তার মা, শুকোলেই এটা ধরে ধরে কাপড়টা খুলে নিয়ে এস। পারবে তো ?

সারদা বলল—হ্যাঁ পারব।

—পা টিপে টিপে গিয়ে রোজ এই ঘাটে চান করতে পারবে তো ?

—হ্যাঁ, তাও পারব! দু' একদিন করলেই অভ্যাস হয়ে যাবে।

—যদি না পার তবে কাউকে ডেক। অন্ধ জেনে তোমাকে একটু সাহায্য করবে।

মুক্তা এসব কথার কোন অর্থ বুঝল না। সে বোকার মত দু'জনের মুখের দিকেই বারবার তাকাতে লাগল।

ফিরে আসবার সময় মুক্তা বলল—এ কি, মা, তুমি যাবে না ?

সারদার দু'চোখ ছাপিয়ে জল আসছিল। তাড়াতাড়ি মুছে বলল—না মা, একটু পরে যাব।

—কেন মা ?

—আমার এখানে থাকতে হবে, পুজো দিতে হবে।

—তবে আমিও থাকব মা। আমিও পরে যাব।

—ছিঃ, ছোট ছেলেমেয়েদের থাকতে নেই। তাদের এ পুজো দেখতে নেই।

—দেখলে কি হয় মা ?

—তাদের মা মরে যায়।

—তাহলে শান্তিপিসীর সঙ্গে আমি চলে যাই। তুমি একটু পরে যাবে তো ?

—হ্যাঁ যাব!

—তবে কাঁদলে কেন ?

সারদা কি বলবে সহসা ভেবে পেল না। আর কিছু জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল—না, কাঁদিনি তো, অমনি চোখে জল এসেছে!

—কার সঙ্গে যাবে মা ? তুমি যে চোখে দেখতে পাও না!

শান্তিলতা বলল—আমিই এসে নিয়ে যাব, অত ভাবতে হবে না। এখন চল।

অনেকটা টানতে টানতেই মুক্তাকে নিয়ে শান্তি বাড়ির দিকে চলল। যেতে যেতে মুক্তা বারবার ফিরে তাকাতে লাগল মায়ের দিকে। দেখল, মা অমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কাছে থাকলে দেখতে পারত মায়ের চোখের জল তখন আর গোপন নেই।

সেদিন বিকেল হতেই মায়ের জন্য মুক্তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল—শান্তিপিসী, মা আসছে না কেন ? তাকে আনতে যাবে না ?

শান্তি জবাব দিল—পূজা শেষ হয়নি। পূজা শেষ হলেই গিয়ে নিয়ে আসব।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। তবু মা এল না। মুক্তা বলল—মাকে নিয়ে আসবে না, পিসী ?

শান্তির সেই একই জবাব।

কিন্তু সেই জবাবে শান্ত হয় না মুক্তার মন। সে কাঁদতে থাকে। অনেক কষ্টে শান্তিলতা তার কান্না থামায়।

বাড়ির লোকেরা বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে—ঝিয়ের মেয়ের জন্য এত দরদ কেন ? ওকেও দিয়ে এলি না কেন ওর মায়ের সঙ্গে ?

শান্তিলতা সবার মুখের দিকে ইশারা করে কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু চাপা থাকে না। নানা কথার আকারে তা বেরিয়ে পড়ে।

শান্তিলতা মুক্তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সংসারের নানা চক্রান্তের মাঝ থেকে ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

কিন্তু পরদিন সকালবেলা কিছুতেই রাখতে পারা যায় না মুক্তাকে। সে মায়ের কাছে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। অগত্যা শান্তি মুক্তাকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে রওনা হল।

সারদা ছাতওয়ালা অতিথিশালার এক ধারে চুপ করে বসে আছে। দূর থেকেই মুক্তা ডেকে উঠল—মা, মা!

সারদা চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল—কে, মুক্তা!

মুক্তা মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল—মা, তুমি যাওনি কেন? পূজা তোমার এখনও শেষ হয়নি?

অতি কষ্টে কান্না চেপে রেখে সারদা বলল—না মা, পূজা তো শেষ হয়নি।

অভিমান-ভরা কণ্ঠে মুক্তা জিজ্ঞেস করল—কবে শেষ হবে? তুমি খালি দেরি করছ। আমি তোমার কাছে থাকব।

সারদা মুক্তার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—এখানে থাকলে তোর কষ্ট হবে মা। তুই তোর শান্তিপিসীর কাছেই থাকিস।

মুক্তা বলল—তুমি যে এখানে থাক, তোমার কষ্ট হয় না?

সারদা বলল—আমি তো বড়, আমি কষ্ট সহ্য করতে পারি। তুই ওসব পারবি না।

—খুব পারব।

—না, পাগলামী করে না। তোর শান্তিপিসীর কাছে থাকিস। তাকে মা বলে ডাকিস। কেমন?

মুক্তা বলল—যাঃ, তুমি তো মা।

সারদা বলল—আমি যদি মরে যাই!

মুক্তা কিছু না বলে বোকার মত মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সারদা শান্তিলতার হাত ধরে বলল—আমার আর কেউ নেই দিদি, শুধু এই মুক্তা। একে তুমি দেখে শুনে রেখ।

শান্তিলতা বলল—আমিও তো ও বাড়িতে পরের অধীন, মুক্তার মা। আমাকেও তো কত কথা শুনে থাকতে হয়।

সারদা বলল—তা কি আর আমি জানি না দিদি? যদি তুমি নাই পার তবে কোন ভাল লোকের কাছে মুক্তাকে দিয়ে দিও। ও যেন না খেয়ে মরে না যায়।

সারদা এবার কেঁদেই ফেলল। মায়ের কান্না দেখে মুক্তাও কাঁদতে লাগল।

শান্তি বলল—তোমরা শুরু করলে কি! ছিঃ, লোকে দেখলে কি বলবে। আয় মুক্তা, বাড়ি যাই। তোর মাকে পরে এসে নিয়ে যাব।

কিন্তু মুক্তা যেতে চায় না। সে বলল—না, মা আর যাবে না। আমি এখানেই থাকব।

শান্তি এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল মুক্তাকে, এখানে থাকবি তো খাবি কি? চল, কত কষ্ট তোর কপালে আছে কে জানে!

মুক্তা অশ্রু ছলছল চোখেই শান্তির সঙ্গে চলল। (ক্রমশঃ)

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

৯

এতদিন পরে মা আর মুক্তার জন্য মনটা খুবই খারাপ লাগতে লাগল মণির। গঙ্গায় সেদিন কি একটা স্নানের যোগ ছিল। কত মেয়ে পুরুষ ভিড় করে স্নান করতে চলেছে। তার মায়ের মত আর মুক্তার মত কত মেয়ে।

আজ পুতুলের কারখানা এ বেলা বন্ধ। বিকেলে কাজ হবে। মণি হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে আরও ভিড়।

কত লোক আসছে যাচ্ছে। হয়তো তার মা আর মুক্তাও আসবে। যদি দেখতে পায় তাদের! ইস, কি আনন্দই যে তখন হবে!

মণি ঘাটের এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগল। ছোট মেয়ে দেখলেই বুকের ভিতরটা নেচে ওঠে। ঐ বুঝি মুক্তা! উৎসাহ নিয়ে একটু এগিয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণে হতাশায় মনটা ভরে ওঠে। এমন করে অনেকবার এগিয়ে গেল মণি। কিন্তু মুক্তাকে আর মাকে দেখতে পেল না।

ক্রমে ক্রমে বেলা বেড়ে গেল। এবার কারখানার দিকে চলল মণি। খিদে পেয়ে গেছে। দেরি করে গেলে হয়তো এ বেলা খাওয়াই জুটবে না।

কারখানার পাশেই একটা ঘরে দোকানের আর কারখানার লোকদের জন্য রান্না হয়। একজন ঝি আছে। নাম অন্নদা। সে রান্না করে, সবাইকে ভাত দেয়, থালা বাসনও মাজে। বড় তিরিক্ষি মেজাজ তার। খেতে যেতে একটু দেরি হলেই রাগে ফেটে পড়ে। বিড়বিড় করে কত কি বলতে থাকে।

একটু ভয়ে ভয়েই মণি সেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। আজ দেরি হয়ে গেছে। কপালে হয়তো বকুনি আছে।

ঘরের সামনে গিয়ে দেখল, দরজা বন্ধ। তালা দেওয়া। মনে মনে প্রমাদ গণল মণি। কিছুক্ষণ আগে যা ভেবেছিল তাই হয়েছে। ভাত তো কপালে নেইই, তার উপর বকুনি আছে।

যেমন চুপি চুপি এসেছিল তেমনি চুপি চুপি চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু নিস্তার নেই। কয়েক পা এগোতেই অন্নদার সামনে পড়ে গেল।

মণি পথের পাশে দাঁড়িয়ে গেল আচমকা।

হেঁড়ে গলায় অন্নদা চেঁচিয়ে উঠল—কি রে নবাব পুত্তুর, এতক্ষণে বুঝি তোর সময় হল? যা, মাঠে গিয়ে ঘাস খা গে, ভাত হবে না।

মণি আবার চলে যাবার জন্য এগোতেই ঝি বলে উঠল—ইস্, দেমাক তো কম নয়! আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

মণি নির্বাক্ হয়ে ঝিয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঝি আঁচল থেকে একটা চাবি খুলে ছুঁড়ে দিল মণির দিকে। বলল—যা, ঘর খুলে নে। রাজ-ভোগ বেড়ে থালায় চাপা দিয়ে রেখেছি। গিলে খেয়ে নে গিয়ে।

মণি নিঃশব্দে চাবিটা কুড়িয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঝি উঠানে টাঙ্গানো দড়ির উপর ভেজা কাপড় ছড়িয়ে দিতে লাগল। আর নিজের মনেই গজরাতে লাগল—বছরে একটা দিন গঙ্গার যোগ-চানটা করব না? ধম্মকম্ম কি বেলজ্জন দেব চাকরির জন্য? মা গঙ্গা, মা গঙ্গা!

মণি ঘরে গিয়ে দেখল, যে থালা দিয়ে ভাত চাপা দেওয়া ছিল সে থালা ভাতের উপর নেই। একটু দূরে মাটিতে গড়াচ্ছে। ভাঙা জানলা গলিয়ে চতুর বিড়াল এসে তার খাবার প্রায় নিঃশেষ করতে চলেছে। মণির পায়ের সাড়া পেয়েই বেড়ালটি পালিয়ে গেল। মণি সেদিকে তাকিয়ে রইল অসহায়ের মত। তখন পেট তার খিদেয় জ্বলছে। কিন্তু বেড়ালের এঁটো ঐ খাবারের দিকে তাকিয়ে তার গাটা রীরী করে উঠল।

দড়ির উপর অন্নদা ঝিয়ের কাপড় ছড়ানো তখন শেষ হয়ে গেছে। সে তখন উচ্চস্বরে মা গঙ্গার নাম ও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করতে শুরু করেছে।

তার ফাঁকেই একবার চেঁচিয়ে ঝি জানিয়ে দিল —গঙ্গা চান করে এবেলা আর এঁটো বাসন-কোসন ছোঁব না। ওগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখিস, ওবেলায় এসে ধুয়ে ফেলব।

আবার গঙ্গা ও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করতে করতে ঝি চলে গেল।

মণি কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে থালা, বাটি এক-পাশে সরিয়ে রেখে ঘর বন্ধ করে দিল।

অন্নদা-ঝি আবার কি মনে করে ফিরে এসেছে। এসেই ঝাঁঝালো স্বরে বলল—খাওয়া হয়ে গেল রাজপুত্তুরের? দে, চাবিটা দে। চাবি নিতে ভুলে গেছি।

মণি চাবিটা দেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। অন্নদা দূর থেকে হাতটা বাড়িয়ে বলল—দে, ছুঁড়ে দে। ভাত খাওয়া কাপড়ে আমাকে ছুঁস নে। মা গঙ্গা—মা গঙ্গা—

চাবিটা আঁচলে বেঁধে আবার চলে গেল অন্নদা।

মণিও বেরিয়ে পড়ল। পেটে তার আগুন জ্বলছে। খিদের আগুন। পকেটে চারটে মাত্র পয়সা আছে। গলির মোড়ের দোকান থেকে মুড়ি মুড়কি কিনে চিবোতে চিবোতে মণি চলতে লাগল।

চলার নেশা মণিকে পেয়ে বসল। সে আজ শুধু চলবে। বড় রাস্তা পেরিয়ে গলি পেরিয়ে শুধুই চলবে সে। খুঁজে বের করবে মা আর মুক্তাকে।

মণি পথ দিয়ে হাঁটে আর দু'পাশের বাড়ির আঙিনার দিকে তাকায়। কখনো তাকায় খোলা জানলার দিকে।

এমনি করে কত পথ পেরিয়ে চলল তার হিসাব নেই। কিন্তু কোথাও দেখা পেল না মা আর মুক্তার। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। এবার থামল মণি। সর্বনাশ! অনেক দূরে চলে এসেছে। অচেনা শহর, আবার পথ চিনে যেতে পারলে হয়।

কারখানার কথাও মণির মনে পড়ল। এতক্ষণ জগমোহন কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। মণিকে না দেখে নিশ্চয় গালাগালি করছে। কিছুদিন ধরে ভয়ানক মেজাজ খারাপ হয়েছে জগমোহনের। অকারণে গালিগালাজ করে। কাজের একটু খুঁত দেখলেই ধমক দেয়।

জগমোহন এখন আর তার উপর মোটেই খুশী নয় তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচে।

আজ কপালে অনেক দুঃখ আছে তার। সকাল থেকেই কি যে তার হয়েছে, কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। দুপুরে ঝিয়ের বকুনি খেয়েছে। ভাত খেতে পায়নি। ওবেলা খেতে হবে জগমোহনের বকুনি। আরও বিশ্রী—আরও নোংরা।

মণি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরল। থাকবার অন্য কোন জায়গা থাকলে আজ কিছুতেই সে কারখানায় ফিরে যেত না।

পথে পথে কত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৈ, সবাই তো এরকম চাকরি করে না। ভাল কাপড় জামা পরে কত লোক চলেছে হেঁটে, কেউ বা গাড়িতে। তারা কোথায় পায় এত ভাল কাপড় জামা? কেমন করে চড়ে গাড়িতে? এত পয়সা পায় তারা কোথায়?

মণির মনটা যেন ছোট হয়ে গেল। উৎসাহ কমে যেতে লাগল। নিজেকে যেন কেমন কুৎসিত মনে হতে লাগল পথের এই লোকজনের মাঝখানে। সংকুচিত ভাবে সে এক পাশ ঘেঁষে চলতে লাগল।

পথে গলি চিনে নিয়ে ফিরতে গিয়েও ভয়ানক অসুবিধা হল মণির। অচেনা পথ—এখন যেন আরও অচেনা লাগতে লাগল। যাবার সময় পথ সে রকম দেখেছে, এখন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বিজলী বাতি, গ্যাস বাতি জ্বলে উঠল। ঝলমল করতে লাগল কলিকাতা শহর।

মণির চোখ যেন আরও ধাঁধিয়ে গেল। পথ ঘাট সব গুলিয়ে যেতে লাগল চোখের সামনে। মণি ভয়ে ভয়ে দিশেহারার মত চলতে লাগল। একটু চলে আবার একটু পিছন ফিরে তাকায়। দেখে ঠিক পথে চলেছে কিনা।

একটা গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে জড় হয়েছে সেখানে। কৌতূহলী হয়ে মণি তাকিয়ে দেখল, একটা লোক পুতুল বিক্রি করছে! তাকে ঘিরেই ছেলেমেয়েরা ভিড় করেছে।

ঝুড়ি কাঁধে করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। তার ঝুড়িতে হরেকরকম মাটির পুতুল। কেনার চেয়ে দেখাতেই যেন ছেলেমেয়েদের আনন্দ বেশী।

মণি কাছে গিয়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হয়তো মুক্তা আছে এই দলে। সে যা পুতুল ভালবাসে! পুতুল দেখলে কিছুতেই ঘরে থাকবে না। ছুটে আসবেই পুতুলওয়ালার কাছে।

মণি দম না ফেলে চেয়ে চেয়ে সব ছেলেমেয়েদের মুখ দেখতে লাগল। একে একে সবাইকে দেখা হয়ে গেল। তখন বুক থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর নিশ্বাস।

মুক্তা নেই এই দলে।

তবু হাল ছাড়ল না মণি। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কারখানায় ফেরবার কথা যেন ভুলেই গেল সে!

পুতুলওয়ালা তখন ছড়া গাইতে শুরু করেছে। তার পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। ছড়ার তালে তালে পা নাচাচ্ছে—

খোকা এসো খুকু এসো
পুতুল কিনে নাও,
যাবার বেলায় দু'টি চারটি
পয়সা দিয়ে যাও।
ঘোড়া কিনবে, হাতী কিনবে
কিনবে বিড়ালছানা,
দেখো কেমন রাঙা পুতুল
টুকটুকে মুখখানা।
দল বেঁধে সব খোকাখুকু
এসো আমার কাছে,
দিয়ে দেবো সবই পুতুল
যতো আমার আছে।

দু'চারজন ছেলেমেয়ে পুতুল কিনে চলে গেল। আবার কয়েকজন নূতন ছেলেমেয়েও আসতে লাগল। মণির খুব মজা লাগছে দেখতে। মুক্তার মত, মুক্তার চেয়ে বড়, কেউ বা মুক্তার চেয়েও ছোট দেখতে। কিন্তু মুক্তা নয়।

গাঁয়ের সেই মেলার কথা মণির মনে পড়ে গেল। সেই পুতুলের কথা। মুক্তার কথা। বুকের ভেতরটা খচখচ করতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল মণির। চমৎকার বুদ্ধি। সে এই পুতুলওয়ালার মত পথে পথে ঘুরে পুতুল বিক্রি করবে। পুতুল পুতুল করে ডাকবে। পুতুলের ডাক শুনে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে মুক্তা। যেখানেই থাক, কোলকাতার কোন পথে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তাকে।

মণির সমস্ত দুঃখ আর পরিশ্রম যেন এবার লাঘব হয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে আবার পথ চলতে লাগল।

কিন্তু পথ নিশ্চয়ই ভুল করেছে মণি। যাবার সময় তো এরকম গলি আর দালান কোঠা সে দেখেনি। এ পথ ছেড়ে ও পথ—এ গলি ছেড়ে ও গলি—ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল।

কান্না পেতে লাগল তার। যে রাস্তায় থাকে সে-রাস্তার নামও সে জানে না। লোকের কাছে কি করে জিজ্ঞেস করবে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে এল কালীঘাটের মন্দিরে যাবার পথটা পেলেই সব কিছু সে খুঁজে পাবে। তাই একটা দোকানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—কালীঘাটের মন্দির কোন্ দিক দিয়ে যাব?

দোকানদার বলল—এই গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে ওঠ! তারপর সোজা হাঁটতে শুরু কর দক্ষিণ দিকে।

মণি উত্তর দক্ষিণ চেনে না। তবু গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর সোজা হাঁটতে শুরু করল।

আবার খিদে পেয়েছে। ভয়ানক খিদে। সারাদিন শুধু দুমুঠো মুড়ি খেয়ে সে কাটিয়েছে। এখন ভাত খেতে মন চাইছে। ভাত না খেলে কিছুই যেন ভাল লাগবে না। ভাত—শুধু দু'মুঠো ভাত খেতে পেলেই সে বেঁচে যায়।

মণি হাঁটতে হাঁটতে আর এক জায়গায় এসে থামল। যেন চেনা চেনা লাগছে জায়গাটা। রাস্তার পাশে ঐ তো পানের দোকান। পানওয়ালা বসে থাকে কপালে মস্ত তিলক কেটে। মণি এবার চিনতে পেরেছে। পাশের গলি দিয়ে বাঁ ধারে গেলেই সে কারখানার পথ ধরতে পারবে।

কিন্তু রাত হয়ে গেছে অনেক। বকুনি খেতে হবে। কপালে আরো কত দুর্ভোগ আছে কে জানে?

সে কথাটা ভাবতেই মনটা দমে গেল তার।

হাঁটায় উৎসাহ গেল কমে। ধীরে ধীরে পা দুটো যেন জড়িয়ে আসতে লাগল।

গলিটা পেরিয়েই একটা ছোট পার্ক। মণি এগুলিকে বলে বেড়া দেওয়া মাঠ। তাদের গাঁয়েও এরকম মাঠ আছে—এর চেয়েও সুন্দর মাঠ! কিন্তু তাতে তো বেড়া দেওয়া থাকে না। লম্বা টুল পাতাও থাকে না তাতে। কলকাতার মাঠগুলি এরকম কেন? মণি এর কারণ খুঁজে পায় না।

মণি সেই পার্কেই ঢুকে পড়ল। একটা লম্বা বেঞ্চি খালি ছিল। তার উপরই শুয়ে পড়ল মণি।

পা টনটন করছিল। টুলের উপর পা দুটি মেলে দিয়ে সে যেন অনেক আরাম বোধ করল। খিদের কথা এখন থাক। জগমোহনের ধমক থেকে আর অন্নদা ঝির বকুনি থেকে সে যে রেহাই পেয়েছে তাই যথেষ্ট।

মণি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুজল। কারখানা—জগমোহন—অন্নদা-ঝি সব যেন ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসতে লাগল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল মণি তা জানে না। হঠাৎ লাঠির খোঁচায় তার ঘুম ভাঙল। চোখ খুলেই মণি শিউরে উঠল। পুলিস দাঁড়িয়ে আছে।

সেই পুলিস! বর্ধমান স্টেশনেও পুলিস তাকে এমনি করে ধরেছিল। ভয়ে তার বুক কাঁপতে লাগল। আজ তাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে না তো?

পুলিস বলল—এই লেড়কা, কাহে হিয়া ঘুমাতা হায়?

মণি জড়সড় হয়ে বেঞ্চির উপর উঠে বসল।

পুলিস বলল—ভাগো, জলদি ভাগো হিয়াসে।

মণি হিন্দী না জানলেও এটা বুঝতে পারল, পুলিস তাকে চলে যাবার জন্য বলছে।

পুলিস দেখে মণি জড়সড় হয়ে বেঞ্চির উপর উঠে বসল।

মণি তাড়াতাড়ি উঠে পার্ক থেকে বেরিয়ে পড়ল। যাক, পুলিসটা তাহলে ভাল লোক। তাকে ধরেনি। বর্ধমানের পুলিস হলে তাকে ধরে নিয়ে যেত। জেলে পুরে দিত।

মণি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু একি! সে হাঁটতে পারছে না কেন? পা কাঁপছে, পা কাঁপছে। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। কি যেন হয়েছে তার।

অতি কষ্টে মণি চলতে লাগল। কিন্তু যাবে কোথায়? রাস্তায় অন্য কোথাও শুয়ে থাকলে যদি পুলিসে ধরে?

বাঁকটা ঘুরলেই কারখানার পথ। মণি অগত্যা কারখানার দিকেই চলতে লাগল।

রাত তখন অনেক। রাস্তায় লোকজন নেই। মাঝে মাঝে দু'একজন চলাচল করছে। ফুটপাথের উপর শুয়ে আছে দুজন ভিখারী। কিন্তু সেখানে শুতেও আর তার ভরসা হল না। এক পা দু'পা করে কারখানার বাড়ির দিকে চলল।

কারখানার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল মণি। বাড়িটা অন্ধকার। সবাই ঘুমিয়ে আছে। রান্না-ঘরের অন্নদা-ঝিয়েরও কোন সাড়া শব্দ নেই।

মণির গা কাঁপছে। পা কাঁপছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। কারখানার ছোট্ট বারান্দার উপর গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখল কারখানার বারান্দায় সে নেই। কোথায় যেন শুয়ে আছে। গায়ে মাথায় ভীষণ ব্যথা। একটু চোখ খুলে কাতর কণ্ঠে নিজের অজান্তেই যেন ডাকল—মা!

কিরে? মেয়েলী কণ্ঠে কে সাড়া দিল।

জ্বরের ঘোরেও চমকে উঠল মণি। সত্যি কি তার মা ফিরে এসেছে?

মণি আবার চোখ মেলে চাইল।

এখন কেমন লাগছে মণি? বলে হাতের কাজ ফেলে অন্নদা-ঝি মণির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।

মণি যেন স্বপ্ন দেখছে। কালকের অন্নদা-ঝি আর আজকের এই অন্নদা! এই দুয়ের ভিতর কত প্রভেদ! সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। মণি এতক্ষণে বুঝতে পারল সে রান্নাঘরের এক কোণে শুয়ে আছে। কেমন করে এখানে এল তা সে জানে না। কাল রাতের সমস্ত ঘটনাও যেন আবছা আবছা মনে পড়ছে।

অন্নদা-ঝি কার উদ্দেশ্যে যেন বলতে লাগল—ধর্মে সইবে না। কচি ছেলে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, তাকে এমন লাথি মারা কি ভাল হয়েছে? মা কালী দেখবে—মা গঙ্গা দেখবে—

মণি বিষম যন্ত্রণায় চোখ বুজল। (ক্রমশঃ)

নামকরণ

পূরবী দেবী

কলকাতা নাম হল কেন জান?

অনেকের কাছেই হয়তো শুনেছ। একবার একটা সাহেব পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় একটা ঘেসেড়াকে দেখতে পায়। তার পাশে প্রচুর স্তুপীকৃত ঘাসের পাহাড়। সাহেব জিজ্ঞাসা করলে জায়গাটার নাম কি?

ঘেসেড়া তো আর ইংরাজী জানে না। সাহেবের কথা শুনে ঘেসেড়া মনে করলে সাহেব বুঝি ঘাসটা কবে কেটেছি জিজ্ঞাসা করছে।

তাই সে বললে, কাল কাটা।

ঘেসেড়ার কথা শুনে সাহেব বুঝলে জায়গাটার নাম ক্যালকাটা।

সেই থেকে কলকাতা নাম চালু হয়ে গেল।

ঠিক এইভাবে অস্ট্রেলিয়ার জানোয়ার ক্যাঙ্গারুর নামকরণ হয়েছে বলে মনে হয়। একবার একজন লোক বেড়াতে বেড়াতে একটা ক্যাঙ্গারুকে লাফিয়ে যেতে দেখে একজন স্থানীয় অধিবাসীকে প্রশ্ন করে এটার নাম কি?

লোকটি নিজের ভাষায় বলে ক্যাং গা রু। অর্থাৎ আমি জানি না।

যে প্রশ্ন করেছিল সে ভাবলে জন্তুটার নাম ক্যাঙ্গারু। তারপর লোকের মুখে মুখে ঐ নাম ছড়িয়ে পড়ল।

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

১০

শান্তি পিসী ছাড়া মুক্তার আর কেউ নেই। মা চলে যাবার পর সে বুঝতে পারল এ বাড়ির আর কেউ তাকে চায় না। সবাই তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচে।

সে তার মায়ের কাছে যেতে চায়, কিন্তু শান্তি পিসী তাকে নিয়ে যায় না। কয়েকদিন সে খুব কেঁদেছে। কিন্তু এখন আর কাঁদে না। কাঁদতে ভয় পায়। কাঁদলেই বাড়ির লোকেরা বকে। আর মোটা লোকটা কি ধমক দেয় তাকে!

মায়ের কাছে যেতে চাইলেই শান্তি পিসী তাকে বলে—মায়ের কাছে এখন যেতে নেই রে। তোর মায়ের পুজো তো এখনো শেষ হয়নি।

মুক্তা জিজ্ঞেস করে—কবে শেষ হবে পিসী?

শান্তিলতা জবাব দেয়—শেষ হলে ঠিক সে চলে আসবে।

মুক্তা বলে—কিন্তু মা যে চোখে দেখতে পায় না, একা কি করে আসবে?

শান্তিলতা বলে—আমি গিয়ে নিয়ে আসব। এখন যাস না, তা হলে তোর মা কিন্তু মরে যাবে।

মুক্তা শিউরে ওঠে। হ্যাঁ, মা-ও তো তাকে বলেছে পুজোর সময় কাছে থাকতে নেই, তা হলে মা নাকি মরে যায়। কিন্তু সে তো থাকবে না, মাকে একটু দেখেই চলে আসবে। তবু শান্তি পিসী এরপর একদিন মাত্র নিয়ে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায় নি।

অনেক লোক আসে বাড়ির কর্তা ভোলাবাবুর কাছে। ভোলাবাবুর মত ভুঁড়িওয়ালা লোকও আসে। ওরা কেমন করে যেন কথা বলে। ওদের কথা মুক্তা বুঝতে পারে না। একদিন ভোলাবাবু মুক্তাকে দেখিয়ে ওদের কাছে যেন কি বলল। ওরা মুক্তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেল।

আর একদিন এল সেই ভুঁড়িওয়ালা দুটো লোক। ভোলাবাবু মুক্তাকে বললেন—মুক্তা,

দেখ ঐ লোকগুলি তোর জন্য কি এনেছে। যা, ওদের কাছে যা। ওরা তোকে ডাকছে।

মুক্তা বুঝতে পারল না, লোকগুলি তাকে ডাকছে কেন। তবু তাকে যেতেই হল লোক দুটি মুক্তাকে কাছে ডাকল। জিজ্ঞেস করল—খোকি, তোমার নাম কি ?

মুক্তা লজ্জায় জড়সড় হয়ে জবাব দিল—মুক্তা।

লোক দুটি বলল—বাঃ, বহুত আচ্ছা নাম।

টুপি মাথায় লোকটি বলল—মুক্তা, হামাদের মুল্লুকে যাবে ?

অন্য লোকটি সন্দেশের একটি বাক্স মুক্তার হাতে দিয়ে বলল—এই নাও, মেঠাই খাও।

মুক্তা সন্দেশ নিতে চাইল না। লোক দুটি বলল—খাও খোকী, বহুৎ আচ্ছা মেঠাই। হামাদের মুল্লুকে গেলে আউর মেঠাই দেবো। যাবে হামাদের মুল্লুকে ?

মুক্তা ফ্যাল ফ্যাল করে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কোন জবাব দিল না।

ভোলাবাবু মুক্তার হয়ে জবাব দিলেন—যাবে। মুক্তা খুব বাধ্য মেয়ে। সবার কথা শোনে। তোমাদের দেশে গিয়ে অনেক সন্দেশ খাবে। খা মুক্তা, সন্দেশ খা।

মুক্তা তখন আর আপত্তি করল না। একটা সন্দেশ ভেঙে মুখে দিল। সত্যি খুব ভাল সন্দেশ। ইচ্ছা করল বেশী করে খেতে—কিন্তু পারল না। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর লোক দুটি চলে গেল।

শান্তি পিসী তখন বাড়ি ছিল না। সে বাড়ি ফিরতেই মুক্তা সব কথা তাকে বলল।

শান্তিলতা মুক্তাকে কাছে টেনে নিয়ে চুপি চুপি বলল—আর কখখনো ওদের কাছে যাবি না। ওরা ভারী দুষ্টু লোক।
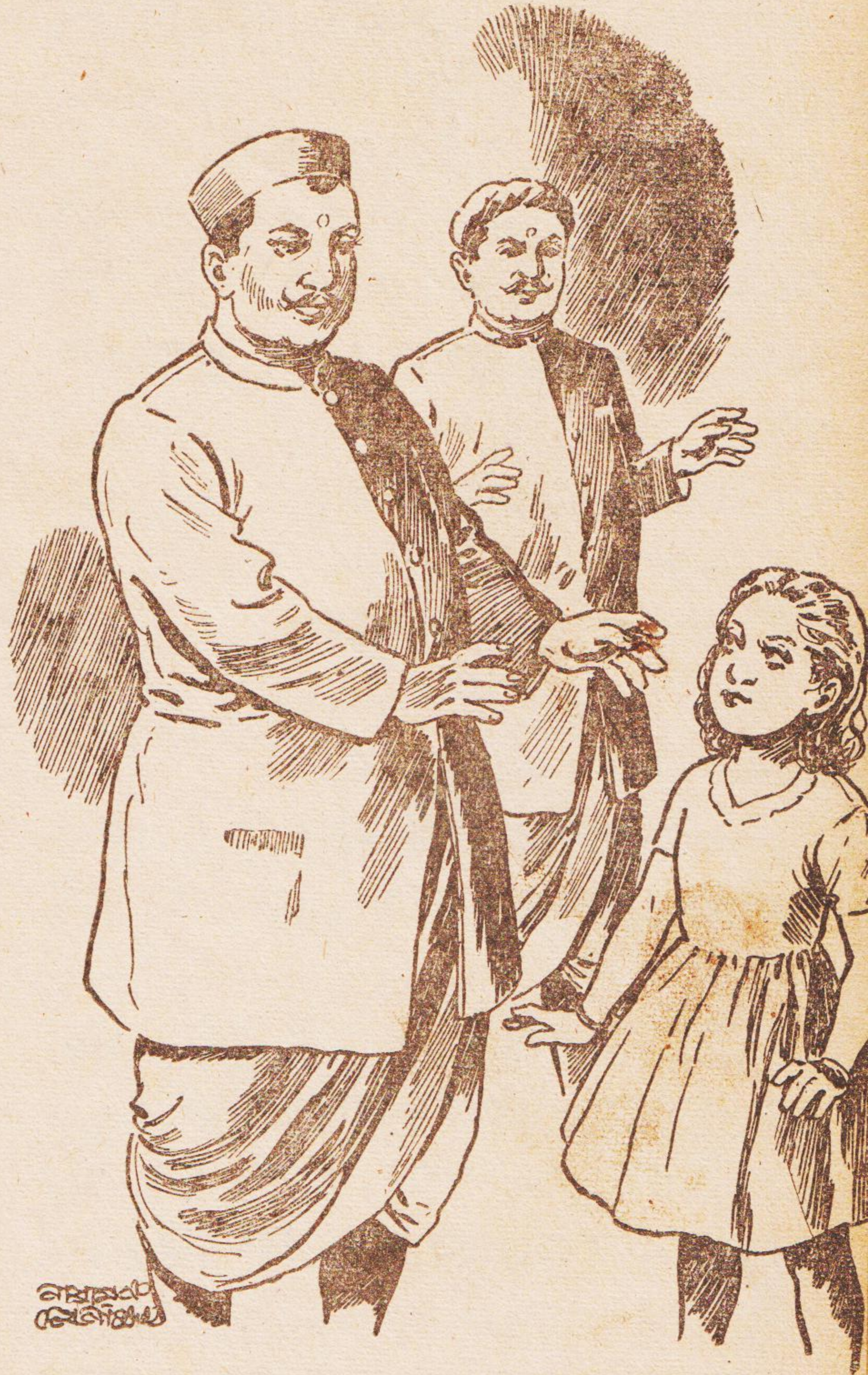
—মুক্তা, হামাদের মুল্লুকে যাবে ?

মুক্তা অবোধের মত জিজ্ঞেস করল—কেন ? ওরা কি করবে ?

শান্তিলতা জবাব দিল—ওরা তোকে অনেক দূরে নিয়ে বিক্রি করে দেবে। ওরা ছেলেধরা।

ভয়ে মুক্তার মুখ শুকিয়ে গেল। শান্তিলতাকে জড়িয়ে ধরে বলল—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না শান্তিপিসী।

শান্তিলতা বলল—সাবধান, তোর কাছে এসব কথা বলেছি, কাউকে বলবি না।

মুক্তা জিজ্ঞাসা করল—কেন ? তাহলে কি হবে ?

শান্তিলতা জবাব দিল—তা হলে আমাকে সুদ্ধু এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে।

মুক্তা বলল—না, কাউকে বলবো না।

শান্তিলতা মুক্তাকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল—তোকে কোন ভাল লোকের আশ্রয়ে দিতে পারলে আমিও বেঁচে যাই রে মুক্তা। এ বাড়িতে আমি আর থাকবো না।

—কোথায় যাবে পিসীমা?

—কাশীতে।

—কাশী বুঝি খুব ভাল জায়গা?

—হ্যাঁ।

—আমাকেও নিয়ে যাবে?

—তুই কাশীতে গিয়ে করবি কি? ছোট ছেলেমেয়েরা কাশী যায় না রে। বুড়ো হলে কাশী যায়।

—তুমি তো বুড়ো হওনি শান্তি পিসী। বুড়ো হলে চুল পাকে। তোমার তো চুল পাকে নি।

শান্তিলতা এর জবাব খুঁজে পায় না। অকারণেও তার চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে।

অন্নদা মণিকে সেদিনই সেই রান্নাঘর থেকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। একটু দূরেই আর একটা বস্তিতে তার ঘর! যেমনি ছোট, তেমনি অন্ধকার।

তবু সেখানে অন্নদার যত্নে মণি ভাল হয়ে উঠল। জ্বর সেরে গেল, কিন্তু দুর্বলতা সারল না।

অন্নদা নিজের পয়সা খরচ করে হোমিও-প্যাথিক ওষুধ এনে মণিকে খাওয়াল।

একটু সেরে উঠলে অন্নদা মণিকে বলল—তুই অন্য জায়গায় একটা কাজের যোগাড় করে নে মণি। ঐ ছোটলোকের চাকরি আর করিস না।

মণি জিজ্ঞেস করল—কোথায় কাজ করব ঝি-মাসী?

অন্নদা বলল—যেখানে হোক, এখানে নয়। সেদিন আমি গিয়ে না পড়লে জগমোহন তোকে মেরেই ফেলতো। দেখলাম, তুই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছিস, আর জগমোহন তোকে লাথি মেরে বলছে—ওঠ হতভাগা, নেকামী করে শুয়ে আছিস। কাজে ফাঁকি দেওয়ার মতলব!...আমি গিয়ে ওকে থামালাম। তোকে রান্নাঘরের এক কোণে শুইয়ে দিলাম। ছিঃ, জ্বরের মানুষকে এমন করে লাথি মারে? ধর্মে সইবে না।

মণি আর কোন কথা না বলে অন্নদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যে অন্নদাকে সে তিরিক্ষী মেজাজের ঝগড়াটে মেয়েমানুষ বলে জানত, তার ভেতর যে এমন একটা কোমল প্রাণ থাকতে পারে তা মণি কোনদিন ভাবতে পারে নি। এই অন্নদা না থাকলে আজ তার কি অবস্থা হত কে জানে।

মণি আবদারের সুরে বলল—আমি আজ ভাত খাবো ঝি-মাসী।

অন্নদাকে ঐ বাড়িতে অনেকেই ঝি-মাসী বলে ডাকত।

অন্নদা স্নেহের শাসনের ভঙ্গিতে বলল—আজ নয় মণি। ডাক্তার খেতে মানা করেছে। কাল ভাত খাবি।

—আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে।

—সাগু জ্বাল দিয়ে রেখেছি, তাই খা। আর মুড়ি কিনে দিয়ে যাব। দুপুরে তাই খাস। আজ আবার আমাকে এক্ষুনি কাজে যেতে হবে।

—এত সকালে কেন ঝি-মাসী?

—আজ নতুন জায়গায় কাজে যাব। তাই একটু সকাল সকাল যাচ্ছি।

—কারখানায় রান্না করতে যাবে না?

—না, ওদের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। ওসব ছোটলোকের জায়গায় কাজ করতে নেই।

মণির মনটা যেন একটু দমে গেল। ওরা লোক খারাপ হলেও পুতুলের কারখানায় কাজ করে মণি আনন্দ পেত। পুতুলকে সে ভালবাসে খেলার সাথীর মত। মুক্তার মত।

মণি বলল—কাল আমাকে আট আনা পয়সা দেবে ঝি-মাসী ?

অন্নদা জিজ্ঞেস করল—পয়সা দিয়ে কি করবি ?

মণি বলল—পুতুল কিনবো। পুতুল কিনে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রী করবো।

অন্নদা ভাবল, এটা মন্দ বুদ্ধি নয়। তাই বলল—এত ব্যস্ত কেন ? শরীরটা একটু সারুক। আট আনা কেন, একটা টাকা দেব তোকে।

মণি আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। খিদের কথা যেন ভুলেই গেল।

অন্নদা মণিকে সাগু খাইয়ে চলে গেল নতুন জায়গার কাজে। মণি বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুতুলের কথা নিয়ে ভাবতে লাগল।

এক টাকায় ছোট ছোট অনেক পুতুল হবে। একটা ঝুড়িও কিনতে হবে তাকে। ঝুড়ির ভিতর পুতুলগুলি সাজিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাবে পাড়ায় পাড়ায়। বড় রাস্তা পেরিয়ে গলি পেরিয়ে সে চলে যাবে অনেক দূরে।

কোন্ গলিতে আছে তার মা আর মুক্তা কে জানে ? রোজ রোজ যেতে যেতে একদিনও কি সে গিয়ে পৌঁছাবে না সেই গলিতে ?

নানা কথা ভাবতে ভাবতে মণি ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দুপুর গড়িয়ে পড়েছে। নিঝুম অপরাহ্ণ। রোদ ঘরের চালায় আর ছাতের আলিসায় উঠে গেছে।

মণি উঠেই শিয়রের কাছে পেল একটি ছোট ঠোঙা। তাতে মুড়ি মুড়কি। অন্নদা দিয়ে গেছে। মণি বিছানা থেকে উঠে এসে বারান্দায় বসে বসে খেতে লাগল।

বস্তিবাড়ি ছাড়িয়ে একটু দূরে দেখা যাচ্ছে দু'টি তালগাছ। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। পড়ন্ত রোদের আলো সেই গাছের মাথায় পড়েছে। কয়েকটি চঞ্চল পাখী একবার উড়ে যাচ্ছে আবার গিয়ে বসছে সেই গাছের মাথায়। পাতার মাঝখানে।

মণি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। অনেকদিন আগে দেখা গাঁয়ের স্মৃতিখানি সহসা যেন তার মনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক স্মৃতি। পড়ন্ত বেলায় তালগাছের মাথার ওপর ঐ পাখীদের নাচানাচি। এর সঙ্গে যেন সেই গাঁয়ের পড়ন্ত বেলার কত যোগাযোগ।

দুদিন পরেই মণি বেরুল পুতুল নিয়ে। ঝুড়ি তাকে কিনতে হল না। অন্নদার ঘরের মাচার উপর একটা পুরনো ঝুড়ি ছিল। সেটাকেই একটু বেঁধেছেদে ঠিক করে নিল। এক টাকার পুতুল কিনে ঝুড়িতে সাজিয়ে সে হাঁটতে লাগল।

প্রথমে কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, করতে গিয়ে দেখল তত সহজ নয়। পা কাঁপতে লাগল। বুক ধুকপুক করতে লাগল। আর কেমন যেন লজ্জা লাগতে লাগল তার।

গলির পর গলি পার হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু 'পুতুল' বলে হাঁক দিতে একবারও পারল না। কেমন যেন গলার স্বর জড়িয়ে আসতে লাগল তার।

কিন্তু পুতুল বলে হাঁক না দিলে কে-ই বা জানবে সে পুতুল বিক্রী করছে। কে-ই বা কিনবে তার পুতুল ?

অনেকবার চেষ্টা করার পর একবার সে ডাকল—পু-তু-ল।

এবার সাহস বাড়ল আরও একটু। তারপর

ধীরে ধীরে ডাকতে শুরু করল—পুতুল—পুতুল চাই—

গলি পেরিয়ে সদর রাস্তা। তারপর আবার গলি। এমনি করে মণি অনেকটা পথ এগিয়ে গেল।

এবার ভয় ভয় করতে লাগল।

সেদিনের মত যদি আবার পথ হারিয়ে ফেলে ?

ফিরল মণি। ধীরে ধীরে পা ফেলে আবার পিছন পথে চলতে লাগল।

একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে আসতেই মণি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন ডাকছে তাকে।

মণি চারদিক তাকাতে লাগল।

আবার ডাক এল—পুতুল—পুতুল এসো।

মণি এবার দেখতে পেল জানলার ভেতর থেকে একটি ছোট্ট মেয়ে তাকে ডাকছে, মুক্তা নয়। মুক্তার চেয়েও ছোট।

মণি এগিয়ে গেল।

মণিকে তার দিকে এগোতে দেখে খুশী হয়ে চেঁচাতে লাগল মেয়েটি—পুতুল—পুতুল—

মণি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল—পুতুল নেবে ?

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে বলল—পুতুল দাও।

মেয়েটি একা। ঘরে আর কেউ নেই। মণি হাত বাড়িয়ে একটি পুতুল দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল।

পয়সা দেবে কে ? মেয়েটির কাছে কি পয়সা আছে ?

মণি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। কেউ কোথাও নেই। ভেতর দিকের দরজাও বন্ধ।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে তাকিয়ে রইল পুতুলের দিকে। আর বলতে লাগল—পুতুল—আমার পুতুল দাও।

মাত্র কথা বলতে শিখেছে মেয়েটি। কচি মুখের কি মিষ্টি বুলি ! মণিও এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মেয়েটির মুখের দিকে। মুক্তার মুখ যেন এই মেয়েটির মুখের মাঝে মিশে আছে। ছোট কচিটি হয়ে যেন দাদার কাছে চাইছে তার সাধের পুতুল।

মুক্তার তো সব কিছুর চাইতে প্রিয় ছিল এই পুতুল।

মণি নিঃশব্দে পুতুলটি মেয়েটির হাতে তুলে দিল। তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এল। পেছন ফিরে আর একবারও তাকাল না। যেন কত বড় এক অন্যায় কাজ সে করে ফেলেছে।

সেই গলি পেরিয়ে অন্য গলিতে পড়তেই আবার মণিকে থামতে হল। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরল তাকে।

—এই পুতুলওলা—পুতুল দেখি—

মণি ঝুড়ি নামিয়ে তাদের পুতুল দেখাল।

একটি ছেলে হাতে তুলে নিল একটি পুতুল। জিজ্ঞেস করল—এটা ক' পয়সা ?

দাম চাইতে মণির বুক ধড়ফড় করতে লাগল। পুতুলের দামের হিসাব গেল গুলিয়ে। ঢোক গিলে একটু থেমে বলল—পাঁচ পয়সা।

ছেলেটি বলল—বাঃ বেশ সস্তা তো !

আর একটি মেয়ে ওদিক থেকে একটি পুতুল তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—এটার দাম কত ?

মণি বলল—এটার দাম দশ পয়সা।

—দাও আমাকে।

—আমাকে একটা দাও।

ভিড় বাড়তে লাগল। আট দশটা পুতুল বিক্রী হয়ে গেল। পয়সা হাতে নিয়ে মণির খুশীতে মন ভরে উঠল। সাহসও যেন বেড়ে গেল খুব।

বস্তিতে অন্নদার ঘরে যখন সে ফিরল তখন

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্নদা নিজের ঘরের কাজ সেরে আবার বাইরে কাজে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। কিন্তু মণির জন্যই বুঝি দেরি করছে একটু ?

মণিকে দেখতে পেয়েই বলল—মণি এলি ?

—হ্যাঁ এলাম। এই নাও পয়সা ?

বিক্রির পয়সা অন্নদার হাতে তুলে দিয়ে মণির কি আনন্দ ! আপন মায়ের হাতে কোনদিন সে রোজগারের পয়সা তুলে দিতে পারে নি। আজ ঝি-মাসীর হাতে তুলে দিয়েও একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব করল। এমন আনন্দ যেন আর সে কোনদিন পায়নি।

অন্নদা পয়সাগুলো গুনে বালিশের তলায় রেখে দিল। বলল—কাল আরো কয়েকটা ভাল পুতুল কিনে নিয়ে যাবি। নানারকম পুতুল না হলে কি বিক্রি হয় ?

অন্নদার কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে। মণিকে তাড়াতাড়ি ভাত বেড়ে দিল। বলল—খাওয়া হয়ে গেলে থালাটা সরিয়ে রাখিস, ফিরে এসে মেজে ফেলবো।

রাত্রে ফিরে এসেও অন্নদা দেখল—মণি ঘুমায়নি। বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে।

অন্নদা জিজ্ঞেস করল—কিরে, ঘুমোসনি যে ?

মণি জবাব দিল—ঘুম আসছে না।

কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করল মণি—ঝি-মাসী, কলকাতা শহরটা কি অনেক বড় ?

অন্নদা জবাব দিল—বড় বই কি ! তুই কি এত হেঁটেও বুঝতে পারছিস না ?

মণি বলল—কাল আরও অনেক দূরে যাব ঝি-মাসী। তা হলে আরও পুতুল বিক্রি হবে।

অন্নদা বলল—যাস। কিন্তু যে গাড়ি-ঘোড়ার পথ, খুব সাবধানে দেখে শুনে চলবি।

মণি ঘাড় নাড়ল।

শান্তিলতা মুক্তাকে নিয়ে খুবই মুশকিলে পড়ে গেছে। মুক্তার ওপর দুর্ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। তাকে ঠিকমত খেতে দেওয়া হয় না। শান্তিলতা বাড়ির বাইরে থাকলেই মুক্তার ওপর উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। দাদা বৌদি কেউ তাকে দেখতে পারে না।

কেন ? একটা ছোট মেয়ে এমন কি অপরাধ করেছে তাদের কাছে ?

শান্তিলতা বুঝতে পারল—মুক্তার ওপর ঘনিয়ে আসছে একটা অজানা বিপদ। (ক্রমশঃ)

ছবিতে আঁক
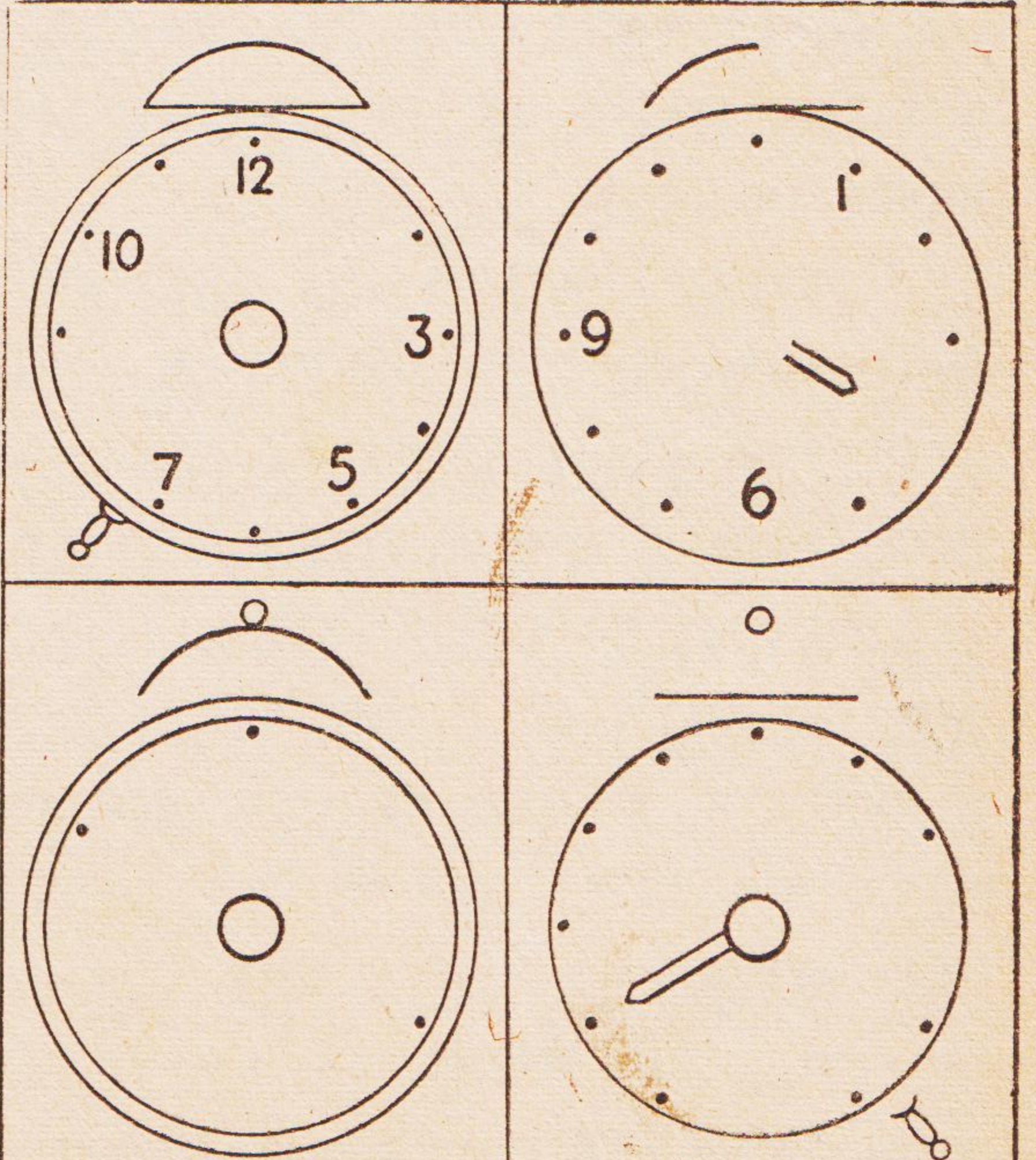
এই এলার্ম ঘড়ির প্রতিটি ছবিই অসম্পূর্ণ। দেখতো তুমি সম্পূর্ণ করতে পারো কি না ?

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

১১

শান্তিলতার মনটা সেদিন ভাল নয়। সে টের পেয়েছে দু'একদিনের মধ্যেই তার দাদা মুক্তাকে এই বাড়ি থেকে সরিয়ে দেবে। সেই হিন্দুস্থানী লোকদের কাছে বিক্রি করে দেবে মুক্তাকে। না, তা হলে তো আর চুপ করে বসে থাকা চলে না। কি করে মুক্তাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাবে? কোন্ ভাল লোকের আশ্রয়ে দিয়ে দেবে মুক্তাকে? এই চিন্তাই শান্তিলতার মনকে ব্যাকুল করে তুলল।

সে একবার মনে মনে ভাবল, ওর মায়ের কাছেই মুক্তাকে দিয়ে আসবে। সেখানে সে ভিক্ষা করে খাবে—তবু ভাল।

মুক্তাকে এর মধ্যে কোথাও সরিয়ে দিলে দাদা হয়তো ভয়ানক রাগ করবে তার উপর। অকথ্য ভাষায় তাকে গালিগালাজ করবে। করুক। তবু মেয়েটা বাঁচবে। কিন্তু আর একটা কথা চিন্তা করেই মনটা দমে গেল শান্তির। সারদা অন্ধ, ওর কাছে এই কচি মেয়েটা থাকবে কোন্ ভরসায়? কেউ ধরে নিয়ে গেলেও সারদা কিছু করতে পারবে না—এমন কি সে টেরও হয়তো পাবে না।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল।

দুপুর বেলা। চারদিক নিঝুম। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে আছে। মুক্তাও ঘুমিয়ে পড়েছিল। শান্তিলতা খুব আস্তে আস্তে তাকে ডাকল—মুক্তা, মুক্তা, ওঠ—

কয়েকবার ডাকার পর মুক্তার ঘুম ভাঙল। চোখ কচলাতে কচলাতে বলল—ডাকছ কেন শান্তি পিসী?

—চল, আমার সঙ্গে চল।

—কোথায়?

—চল না।

দুজনেই চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথে নেমে কিছুদূর গিয়েই মুক্তা জিজ্ঞেস করল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে শান্তি পিসী? মায়ের কাছে নিয়ে যাবে?

শান্তি বলল—না, আর এক জায়গায় যাব। চুপ, কোন কথা বলিসনি।

মুক্তা নিঃশব্দে শান্তিলতার সঙ্গে চলতে লাগল। সেই পাড়া ছাড়িয়ে পাশের এক পাড়ায় গিয়ে পড়ল

তারা। ছোট্ট একটি বাড়ির দরজায় গিয়ে শান্তিলতা কড়া নাড়ল—ভবানীদি, বাড়ি আছ?

একটি বউ দরজা খুলে দিল—ভবানী।

ভবানী শান্তিকে দেখে অবাক্ হয়ে বলল—ওমা, শান্তিদি! এই দুপুর বেলায় কেন? এই মেয়েটি কে?

শান্তিলতা বলল—দাঁড়াও সব বলছি।

শান্তি সব কথা ভবানীকে খুলে বলল। তারপর অনুরোধ করল—যদি বেশী দিনের জন্য না রাখতে পার তবে অন্ততঃ কয়েকটা দিনের জন্য মুক্তাকে তুমি রাখ। আমি চেষ্টা করে এর পর ওকে না হয় অন্য জায়গায় দিয়ে দেব।

মুক্তাকে দেখে বউটির কেমন যেন মায়া হল। তারপর ওর কাহিনী শুনে মনে দুঃখও হল খুব। তার নিজের কোন ছেলেপুলে নেই। একটা অজানা আকর্ষণের টানে যেন বাঁধা পড়ল তার মন। সে আর কোন আপত্তি করল না। বলল—আচ্ছা, আমার এখানেই থাক। তারপর দেখা যাবে।

মুক্তা কিন্তু এই অচেনা বাড়িতে থাকতে চাইল না। সে শান্তিলতার সঙ্গে চলে আসবার জন্য বায়না ধরতে লাগল। বউটি এক বাটি দুধ, মুড়ি আর কলা এনে ধরল মুক্তার সামনে। এবার মুক্তার মন বুঝি পরিবর্তন হল। সে তাড়াতাড়ি বসে গেল খাবার নিয়ে।

শান্তিলতা বলল—তুই এখানে থাক, অনেক কিছু খেতে পারবি। আমি রোজ দুবেলা এসে তোকে দেখে যাব, তোর কাছে থাকব।

মুক্তা বলল—আমাকে নিয়ে যাবে না?

শান্তি বলল—হ্যাঁ নেব বৈকি। কয়েকদিন বাদে তোকে নিয়ে যাব।

—আজ সন্ধ্যাবেলায় আসবে তো? রাত্রিবেলায় থাকবে তো আমার কাছে?

—দূর বোকা। রাত্রিবেলায় এখানে কি করে থাকব? রাত্রে বাড়ি না ফিরলে আমাকে বকবে না?

মুক্তার মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল। বলল—তাহলে রাত্রে কার কাছে আমি ঘুমোব?

শান্তি বলল—কেন, এই নতুন মায়ের কাছে ঘুমোবি।

মুক্তা বলল—ধ্যেৎ, এটা মা নাকি? মা তো গঙ্গার ধারে আছে।

ভবানী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল—তাহলে আমাকে কি বলে ডাকবে মুক্তা?

মুক্তা খাওয়া বন্ধ করে লজ্জায় মাথা নীচু করল। তা দেখে ভবানী বলল—তোমার যা খুশী তাই বলে আমাকে ডেকো। নাও, এখন খাও।

মুক্তা আবার খেতে লাগল। শান্তিলতা বলল—সন্ধ্যাবেলা আমি আসব, অনেকক্ষণ থাকব তোর কাছে।

ভারী মন নিয়েই মুক্তা জিজ্ঞেস করল—ঠিক আসবে তো?

শান্তি জবাব দিল—হ্যাঁ, আসব রে আসব। রোজ দু'বেলা আসব।

এবার মুক্তা শান্ত হল। খাওয়া শেষ করে শান্তিলতার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। শান্তিলতা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—এবার আসি মুক্তা।

শান্তি অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ি ফিরল।

আরও কয়েকটা নতুন পুতুল কিনে পরের দিন আরও উৎসাহ নিয়ে পথে বের হল মণি। তারপরের দিনও। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর পুতুলের ঝুড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসে।

অন্নদা বলল—তুই একটা দোকান কর মণি। পথে ঘুরে ঘুরে তোর শরীর বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এক জায়গায় বসে বসে পুতুল বেচবি।

মণি বলল—দোকান করলে যে অনেক টাকা লাগে ঝি-মাসী। এত টাকা পাব কোথায় ?

—কত টাকা লাগে রে ?

—কম করে একশো টাকা তো লাগেই।

একশো টাকার পরিমাণটা মোটামুটি বুঝতে পারলেও সঠিক হিসাব অন্নদা বুঝতে পারে না। তাই জিজ্ঞেস করল—একশো টাকা কয় কুড়িতে হয় রে ?

মণি বলল—পাঁচ কুড়ি টাকা।

অন্নদার মনটা একটু প্রসন্ন হল। সে বলল—আমার তো ছয় কুড়ি টাকা জমা আছে রায়বাবুদের কাছে।

মণি জিজ্ঞেস করল—কোন্ রায়বাবু ঝি-মাসী ?

অন্নদা জবাব দিল—আমাদের গাঁয়ে বাড়ি। কলকাতাতেই থাকে। খুব বড়লোক তারা।

—সেই টাকা তোমাকে দেবে ?

—আমার টাকা আমাকে দেবে না কেন ? আমার তো তিনকুলে কেউ নেই। তুই যদি দোকান করিস তবে তোকে সেই টাকা এনে দেব।

সে কথা শুনে মণির মন অজানা পুলকে ভরে উঠল। একটা স্বপ্ন যেন তার চোখের সামনে ছোঁয়া দিয়ে গেল। সে বলল—এখন থাক ঝি-মাসী। পুতুল বেচতে বেচতে একটু পাকা হয়ে নিই। তখন ভাল করে দোকান চালাতে পারব।

অন্নদা হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—তোর মত আমারও একটি ছেলে ছিল রে। তারও তোর মত বুদ্ধি ছিল। সে বলত, বড় হয়ে পুতুলের দোকান করবে—বিস্কুটের দোকান করবে।—

—তোমার সেই ছেলে কোথায় ঝি-মাসী ?

—সে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

—কোথায় ?

—স্বর্গে।

মণি আর কোন প্রশ্ন করল না। অন্নদার চোখে কখন জল এসে গিয়েছিল, নীরবে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

—বল, কোথায় মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছিস। [পৃষ্ঠা ৪৪৮

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল অন্নদা—তোর মা কি নেই রে মণি ?

—হ্যাঁ, মা আছে, ছোট একটা বোনও আছে।

—তবে যে কারখানার লোকেরা বলত তোর কেউ নেই।

—আছে, তবে কোথায় আছে জানি না।

—যদি কোনদিন ফিরে পাস তাদের ?

—কি করে পাব ? এই কলকাতা শহরটা যে অনেক বড়। এখানে কেউ যে কারুর খবর রাখে না।

আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল অন্নদার

বুক থেকে। বলল—তা ঠিক। কিন্তু বেঁচে যখন আছে তখন হয়তো পেয়ে যেতেও পারিস। এই শহরে ঘুরতে ঘুরতে হয়তো একদিন দেখাও হয়ে যেতে পারে।

মণির মনের ভেতরটা যেন আনন্দে আলোকিত হয়ে উঠল। বলল—ইস, তখন কি মজা হবে!

—আমার কথা তখন মনে থাকবে তো?

—হ্যাঁ, খুব থাকবে। তোমার কথা আমি ককখনো ভুলব না। আমাকে তখন দোকান করে দেবে তো?

—হ্যাঁরে দেব, দেব। কিন্তু তোর মা-ই তো তোকে টাকা দেবে। আমার টাকা হয়তো তখন লাগবেই না।

মণি বলল—না ঝি-মাসী, তুমি জান না। আমার মা খুব গরিব। সে খেতেই পায় না। মুক্তাও হয়তো না খেয়ে থাকে।

অন্নদা বলল—তুই দোকান করলে তখন কি আর সে গরিব থাকবে? পেট ভরে তখন তারা খেতে পাবে।

ভাবী সুখের কল্পনায় মণির মন অধীর হয়ে উঠল। সে বলল—তোমায় ঝি-মাসী বলে ডাকব না। শুধু মাসী বলে ডাকব।

—বেশ তাই ডাকিস। আমি যে তোর সত্যিকার মাসী।

অন্নদা মণিকে বুকের মাঝে টেনে নিল।

মুক্তাকে অন্য বাড়িতে দিয়ে আসার পর থেকেই এ বাড়ির আবহাওয়াটা যেন বদলে গেল।

সেদিন কেন জানি ভোলাবাবু অন্যদিনের চেয়ে একটু আগে কাজ থেকে বাড়ি ফিরলেন। ফিরেই টের পেলেন মুক্তা বাড়িতে নেই। তখনই খোঁজ-খবর করতে লাগলেন। শান্তিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—মুক্তা কোথায়?

শান্তিলতা জবাব দিল—জানি না তো।

ভোলাবাবু বললেন—জানি না মানে? তুই যত নষ্টের গোড়া। বল, কোথায় মেয়েটাকে লুকিয়ে রেখেছিস?

শান্তি বলল—ও কোথায় চলে গেছে আমি কি জানি?

ভোলাবাবু মুখ বিকৃত করে বললেন—ন্যাকা আর কি! রাখার সময় খুব গরজ ছিল, এখন চলে যাবার সময় আর কিছু জান না।

শান্তিলতা মুখ বুজেই রইল। কথা বললেই আরো কথা বাড়বে। দাদার স্বভাব-প্রকৃতি সে ভালভাবেই জানে।

ভোলাবাবু তাকে অজস্র গালাগালি করতে লাগলেন। শান্তি সহ্য করতে না পেরে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।

শান্তিলতা ভেবেছিল, সন্ধ্যার একটু পরেই গিয়ে মুক্তাকে দেখে আসবে। কিন্তু যাওয়া আর হল না। সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল। মুক্তাকে সে আশ্বাস দিয়ে এসেছিল—সন্ধ্যাবেলায় তাকে দেখতে যাবে। অনেকক্ষণ তার কাছে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এই ঘটনার পর যাওয়ার কোন উৎসাহ রইল না।

মুক্তা হয়তো আশায় বসে থাকবে তার জন্য। না গেলে হয়তো কাঁদবে। তবু এত কাছে থেকেও তার যাওয়ার উপায় নেই।

চোখের জল শুকোতে না শুকোতেই আবার দু'চোখ জুড়ে কান্না এল।

(আগামীবারে শেষ হবে)

ভাই বোন

রবিদাস সাহারায়

১২

পরদিন সকালবেলা।

ঘুম থেকে উঠেই শান্তির যেন মন কেমন করতে লাগল। মুক্তাকে ভবানীর কাছে দিয়ে এসেছে মাত্র একদিন আগে। কিন্তু তার মনে হতে লাগল যেন অনেকদিন ধরে সে মুক্তাকে দেখছে না। ছোট্ট মেয়েটি তার যে কতখানি মন জুড়ে ছিল তা সে আজ বুঝতে পারল।

কাল সন্ধ্যাবেলায় সে মুক্তাকে দেখতে যায়নি। আজকে সকালেও দেখতে যাবার কথা। যাবে কিনা বসে বসে ভাবছে শান্তিলতা। কাল দাদার বকুনি খাওয়ার পর থেকে মনটা যেন কেমন হয়ে আছে। যেতে পা উঠছে না। মনটা যদিও কেমন করছে, কিন্তু উৎসাহ যেন মন থেকে চলে গেছে।

ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে লাগল। শান্তিলতা ভাবছে যাবে কিনা। মনটা একবার এগোয় একবার পেছোয়। মুক্তা ঐ বাড়িতে কেমন আছে কে জানে? হয়তো ভালই আছে, অথবা কাঁদছে নতুন জায়গায় গিয়ে। হয়তো পথ চেয়ে বসে আছে তার শান্তি পিসীর জন্য।

কি অবস্থায় মুক্তা আছে তা জানবার জন্যও শান্তির মনে কৌতূহলের অন্ত নেই। কিন্তু সেই কৌতূহলকে সে অনেক কষ্টে দমন করতে লাগল। ভোরের চা, জলখাবার সব কিছু যেন তার কাছে আজ বিস্বাদ, কিছুই আর ভাল লাগল না।

অনেকক্ষণ পর শান্তিলতা মন স্থির করল—ভবানীর বাড়িতে যাবে। তৈরী হল যাবার জন্য। এমন সময় তাদের বাড়ির কাছে একটা গাড়ি এসে ভিড়ল। গাড়ি থেকে নামল সেই হিন্দুস্থানী লোক দুটো।

শান্তির যাওয়া আর হল না।

লোক দুটো অনেকক্ষণ ধরে ভোলাবাবুর সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলল। যাবার সময় মনে হল তারা যেন বেশ উত্তেজিত, রাগান্বিত।

ভোলানাথবাবু গম্ভীর ভাবে চুপচাপ অনেকক্ষণ

তাঁর ঘরে বসে রইলেন। বাড়ির কারুর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বললেন না। তারপর স্নান করলেন, খাওয়াদাওয়া সারলেন। খাওয়াদাওয়ার পরই তাঁর মুখের ভাষা ফুটল। শান্তি শুনতে পেল, বৌদিকে ডেকে তার দাদা বলতে লাগলেন—মুক্তা কোথায় আছে শান্তিকে বের করে দিতে বল। ও নিশ্চয়ই খবর রাখে। নইলে একটুখানি মেয়ে কি বাড়ি থেকে একা চলে যেতে পারে? আজকের মধ্যেই যেন মুক্তাকে সে নিয়ে আসে। নইলে ওকি চায় ওর দাদার হাতে হাতকড়া পড়ুক? দাদা একটু থামলেন, আবার বলতে লাগলেন—এ কি ছেলেমানুষ নিয়ে ছেলেখেলা! যদি কেউ পুলিসকে খবর দেয় তখন কি হবে? বাড়ির সবার হাতে তখন হাতকড়া পড়বে না?

দাদার কথা শুনে শান্তিলতার বুক কাঁপতে লাগল। মন ভরে উঠতে লাগল নানা আশঙ্কায়।

অনেকক্ষণ গজর গজর করে ভোলাবাবু নিজে নিজেই ঠাণ্ডা হলেন, তারপর জামাকাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিজের কর্মস্থানেই গেলেন হয়তো। তবে অন্যদিন যে সময়ে যান আজ তার চেয়েও যেতে একটু দেরি হল।

শান্তিলতা সেদিন চান করল না—কিছু খেলও না। বৌদি এসেও ডাকল না তাকে।

এভাবে কেটে গেল অনেকক্ষণ।

নিস্তব্ধ দুপুরবেলা।

কাল এই সময়েই মুক্তাকে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আজও হয়তো বৌদি খেয়েদেয়ে তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তিলতার কোন খোঁজখবরও করেনি। কি আশ্চর্য মানুষ!

শান্তিলতা সেই কখন বিছানায় শুয়েছে, এখনো ওঠেনি। এর মধ্যে ক'বার যে কেঁদেছে, ক'বার চোখের জল মুছেছে তার হিসেব নেই। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—ছিঃ ছিঃ, আমি কি বোকা! ছোট্ট একরত্তি মেয়ের জন্য মিছেমিছি কেন এত অপমান সইছি? আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, একটি ঝিয়ের মেয়ে। তার জন্য এত!

শান্তিলতার রাগ হল নিজের ওপর, অভিমানও হল। ভাবল মায়া-মমতা মন থেকে দূর করে দিতে হবে। নইলে এই সংসারে শান্তিতে বাস করা যাবে না। মনে মায়া-মমতা রেখেই তো এত অশান্তি, এত দুর্ভোগ!

হঠাৎ তার মনের চিন্তার বাঁধন ছিঁড়ে গেল। কে যেন ডেকে উঠল—পিসী, শান্তি পিসী!

উঠে তাকাবার অবসর হল না। ছুটে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তা। বলতে লাগল—পিসী, তুমি কাল সন্ধ্যাবেলা যাওনি, আজ সকালেও যাওনি। কেন যাওনি? কেন?

শান্তিলতা কোন জবাব দিল না। আবেগে ও বিস্ময়ে তার মুখের ভাষা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

মুক্তা বলল—পিসী, আমি চুপি চুপি চলে এসেছি। কেউ আমাকে দেখতে পায়নি।

মুক্তার চোখে মুখে খুশী উপচে পড়ছে। মনে যেন মুক্তির অবাধ আনন্দ।

আকস্মিক মোহ শান্তিলতার মনকে আচ্ছন্ন করল। তার ইচ্ছা হল মুক্তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু মুহূর্তেই সেই দুর্বলতাকে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিল। জোরে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল মুক্তাকে। বলল—দূর হয়ে যা। কেন আবার জ্বালাতে এসেছিস এখানে? নিজেও জ্বলে পুড়ে মরবি আর আমাকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবি। যা, শীগগির যা, পালা এখান থেকে।

আচমকা এমন ব্যাপারের জন্য মুক্তা প্রস্তুত ছিল না। সে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছতে লাগল।

শান্তিলতা জোরে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল মুক্তাকে। [পৃষ্ঠা ৪৮৫

শান্তি বলল—শীগগির যা এখান থেকে। যদি বাঁচতে চাস, এক্ষুণি পালা হতভাগী।

এমন তিরস্কার শুনে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা পেল না। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার সে আর আগের সেই বাড়িতেও গেল না। সোজা চলতে লাগল পথ দিয়ে যে দিকে দু' চোখ যায়।

এই পথ দিয়েই সে শান্তি পিসীর সঙ্গে মায়ের কাছে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিল। অনেকটা যেন চেনা চেনা লাগছে পথটা। সেই পথ দিয়েই সে চলতে লাগল। যেমন করেই হোক মায়ের কাছে পৌঁছোবে। মায়ের কাছেই থাকবে! আর কারুর কাছে যাবে না। আজ তার মনে হতে লাগল, মায়ের চেয়ে আপন পৃথিবীতে আর কেউ নেই! কেউ নেই!

পুতুল নিয়ে পথে বেরুতে মণির কি আনন্দ—কি উৎসাহ! একদিন সেই উৎসাহে বাধা পড়ল। সেদিন পথের পর পথ পার হয়ে চলল, তবু পুতুল বিক্রি হল না। মণি আরও হাঁটতে লাগল। অচেনা পথ। অচেনা দু'ধারের লোকজন। নিত্য নূতন অচেনা পথ দিয়েই সে হাঁটে। একটা চেনা মুখের সন্ধানও কোনদিন পায় না।

তবু মন্দ লাগে না তার নূতন জায়গা দেখতে—নূতন পথ চিনতে। কিন্তু আজ ভারী বিচ্ছিরি লাগতে লাগল। এতক্ষণ হেঁটে হেঁটে একটা পুতুলও বিক্রি হয়নি। আজ মাসীর হাতে কি তুলে দেবে?

একটু আনমনা হয়েই সে বুঝি পথ চলছিল। একটা ছোট গলির মুখ পার হতে গিয়ে হঠাৎ একটা গাড়ির সামনে পড়ে গেল। আচমকা গাড়ির হর্নের শব্দে চমকে উঠল সে। দিশেহারা হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল পথের ধারে।

গাড়ির তলায় চাপা পড়ার থেকে সে বেঁচে গেল, কিন্তু ঝুড়িটা ছিটকে পড়ল মাথা থেকে, নিজেও ব্যথা পেল খুব। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার পুতুলগুলি। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মণি উঠে দাঁড়াল। ঝুড়িটা উঠাতে গিয়ে দেখল পুতুলগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

মনটাও যেন ভেঙে টুকরো হয়ে গেল তার। কান্না পেতে লাগল।

পুতুলের লোভে কতগুলো ছেলেমেয়ে জড়ো হল চারদিকে! তারা ভাঙা পুতুলের টুকরাগুলি কুড়াতে লাগল। খুঁজতে লাগল আস্ত পুতুল পাওয়া যায় কিনা।

একটি মেয়ে সে-পথ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল। রাস্তায় পুতুল ছড়ানো দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে কুড়িয়ে নিল একটা মাথাভাঙা পুতুল। মাথাটাও পেয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে পুতুলটাকে জোড়া লাগাতে লাগাতে বলল—ইস, মুণ্ডুটা একেবারে গেছে! কি সুন্দর ছিল পুতুলটা।

পাশের একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল—এটা ঠিক করে দাও না।

ছেলেটি বলল—ধ্যাৎ, ওটা ঠিক করা যাবে নাকি?

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো সুরে বলল—দেখ না, ঠিক করা যায় কিনা। কি সুন্দর পুতুলটা!

মণি চমকে উঠল। এ যেন পরিচিত গলা। অবাক্ হয়ে তাকাল মেয়েটির দিকে।

মুক্তার কথা মনে পড়ে গেল। মুক্তাও তাকে একদিন এমনি একটি ভাঙা পুতুল জোড়া লাগিয়ে দিতে বলেছিল। এমনি করেই বলেছিল কান্নার সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে। কিন্তু এ তো মুক্তা নয়। মুক্তা আরো ছোট ছিল। আরো একটু ময়লা ছিল তার গায়ের রং। কিন্তু চেহারা ছিল যেন অনেকটা এই মেয়েটির মত।

মণি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি বলল—ও পুতুলওলা, তুমি ঠিক করতে পারবে না? তুমি দাও না পুতুলটা জোড়া দিয়ে।

মেয়েটিও মণির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন থমকে গেল। কি যেন ভাবতে লাগল। কি যেন খুঁজতে লাগল মণির মুখ চোখের মধ্যে।

এই পুতুলওয়ালাকে সে যেন কোথায় দেখে-ছিল, মনে করতে পারছে না। যেন এককালে খুব চেনা ছিল এই ছেলেটি।

এতক্ষণে মণিও যেন একটু একটু চিনতে পারল মেয়েটিকে। তবু লজ্জা ও ভয়ে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে এল। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে ডাকল—মুক্তা!

মুক্তা আরও অবাক্ হয়ে তাকাল মণির দিকে। এত পরিচিত জনকেও সে চিনতে পারছে না!

মণি বলল—মুক্তা, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না? আমি যে মণি।

মুক্তার মুখে এবার হাসি ফুটে উঠল। বলল—দাদা!

মণি জিজ্ঞেস করল—মা কোথায় রে মুক্ত

মুক্তা বলল—ঐ গঙ্গার ঘাটের কাছে আছে, সেখানে যাবি দাদা?

—মা সেখানে আছে কেন রে?

—পূজো করছে।

—পূজো? কি পূজো?

—তা জানি না। মা বলেছে সেখানে নাকি আমাদের থাকতে নেই।

—কেন? থাকলে কি হবে?

—ছেলেমেয়েরা সেখানে থাকলে নাকি মা মরে যায়।

—মা তোকে ভোলাবার জন্য ঐ কথা বলেছে রে। চল তো সেখানে যাই।

মুক্তা এগিয়ে এসে মণির হাত ধরল। বলল—তাহলে চল দাদা। ঐ পুতুলগুলো কুড়িয়ে নিবি না?

মণি বলল—ওগুলো দিয়ে আর কি হবে? সব ভেঙে গেছে।

মুক্তা নিজের হাতের পুতুলটা দেখিয়ে বলল—আর এই পুতুলটা?

—ওটাও ফেলে দে।

—ঠিক করতে পারবি না?

—না, ঠিক করতে হবে না। কালকে আবার অনেক নতুন পুতুল কিনব।

মুক্তা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করল—অনেক পুতুল?

মণি বলল—হ্যাঁ, অনেক। এক ঝুড়ি পুতুল!

—অত পয়সা কোথায় পাবি দাদা?

—পাব পাব। কাল দেখতে পাবি।

খুশীতে মুক্তার মন ভরে উঠল। কিন্তু হাতের

পুতুলটাকে ফেলে দিতে মন চাইল না। হাতেই রেখে দিল।

এবার দু'জনেই তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। মাকে দেখবে! দু'জনের মনে কত আনন্দ।

অনেক ঘুরে ঘুরে ওরা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। মুক্তা ঠিক চিনতে না পারলেও পথ ভুল করেনি। অনেকটা অনুমান করেই হাঁটতে হাঁটতে এসে গেছে সেই ঘাটে যে ঘাটে ওদের মা থাকে।

সারদা বসে আছে স্তব্ধভাবে। এমনিভাবেই সে সব সময় বসে থাকে। একটি হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে—একটি পয়সা দাও বাবা।

মুক্তা দূর থেকেই আঙুল দেখিয়ে বলল—দাদা, ঐ ছাখ, মা।

মণি ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারল না। বলল—ঐ মা? মার অমন চেহারা হয়ে গেছে কেন রে?

মুক্তা কোন জবাব দিল না।

মণি আর একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—একি রে মুক্তা, মা ভিক্ষা করছে কেন?

মুক্তা এবারও কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। শুধু বলল—জানিস দাদা, মা চোখে দেখতে পায় না।

—চোখে দেখতে পায় না! মণির সারাটা গা কেঁপে উঠল।

মুক্তা বলল—হ্যাঁ, তাইতো মা এখানে বসে থাকে আর পুজো দেয়।

দু'জনেই এগিয়ে গেল মায়ের কাছে। প্রায় একসঙ্গেই দুজন চেঁচিয়ে ডাকল—মা!

এমন ডাক সারদা অনেককাল শোনেনি। তার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল—কে রে?

মুক্তা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—মা, দেখ দেখ কে এসেছে। দাদা এসেছে দাদা!

সারদা বলল—দাদা!

মণি বলল—হ্যাঁ মা, আমি মণি।

সারদা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বিস্মিত ও কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করল—মণি?

মণি জবাব দিল—হ্যাঁ মা, আমি মণি। তুমি কি চোখে দেখতে পাও না?

সারদা নীরবে চোখের জলেই তার জবাব দিল।

মুক্তা বলল—রাস্তায় আমি দাদাকে দেখতে পেয়েছি। পুতুল বিক্রী করছিল মা। আমিই দাদাকে এখানে নিয়ে এলাম।

মণি আর মুক্তা জড়িয়ে ধরল মাকে।

সারদা অশ্রু-মাখা অন্ধ চোখের দৃষ্টি নিয়ে বৃথাই দেখতে চেষ্টা করল মণিকে। কতকাল পরে সে ছেলেকে ফিরে পেয়েছে! আজ কি আনন্দের দিন!

কিন্তু সেই পুলকের উচ্ছ্বাস যেন মন থেকে হারিয়ে গেছে। এমন আনন্দটাও সে প্রকাশ করতে পারছে না। মণি ও মুক্তাকে জড়িয়ে ধরে সারদা কাঁদতে লাগল। কি কান্না! সে কান্না বুঝি আর বাঁধ মানতে চায় না।

কান্নাজড়িত কণ্ঠেই সারদা বলল—তুই এতদিন কোথায় ছিলি রে মণি? আমাকে ছেড়ে এতদিন কোথায় ছিলি?

মণি বলল—আমি তো তোমাকেই এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মা।

মণিকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে সারদা বলল—আর তো তুই আমাকে ফেলে চলে যাবি না? বল যাবি না?

মণির চোখেও জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বলল—না মা, আমি আর কোথাও তোমাকে ছেড়ে যাব না।

কত দুঃখ ও অভিমান জমা হয়েছিল সারদার বুকের মাঝখানে। আজ বুঝি কান্না হয়ে সব ঝরে পড়তে লাগল।

—শেষ—